POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا (سورة المائدہ:18)

তাহারা অবশ্যই কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌-তিনিই মরিয়মের পুত্র মসীহ্‌।' তুমি বল, 'আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় কাহার কি ক্ষমতা আছে, যদি তিনি মরিয়মের পুত্র মসীহ ও তাহার মাতাকে এবং যাহারা জগতে আছে তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিতে চাহেন?' (সূরা আল মায়েদা: ১৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 24

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

17 জুন, 2021 ● 6 যুল কাআদা 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর বাণী

দাফনের পর কবরে গিয়ে জানাযা পড়া

১৩৩৭) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ বা বলা হয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা (যে মসজিদে থাকত) মৃত্যু বরণ করে, যার কাজ ছিল মসজিদে ঝাড়ু দেওয়া। রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)কে তার মৃত্যু সংবাদ জানানো হয় নি। একদিন তার কথা তিনি মনে করে বলেন, তার কি হয়েছে? লোকেরা তাঁকে তার মৃত্যু সংবাদ সম্পর্কে অবগত করে। আঁ হযরত (সা.) বললেন, তোমরা আমাকে তার মৃত্যু সংবাদ দাও নি কেন? তারা সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে। (হযরত আবু হুরাইরাহ) বলেন, লোকেরা তাকে তুচ্ছ মনে করেছিল। রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) বললেন, আমাকে তার কবরের সন্ধান দাও। (হযরত আবু হুরাইরাহ বলেন:) অতঃপর তার কবরে গিয়ে তিনি জানাযা পড়ান।

* হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদিন ওলীউল্লাহ্‌ শাহ (রা.) বলেন: 'মানুনা'-র বিষয়টি নিয়ে মতবিরোধ আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠরা এ বিষয়ে পরম বৈধতার ফতোয়া দিয়েছে আর নবী (সা.)-এর কর্মপন্থা থেকে প্রমাণিত। কিন্তু ইমাম মালিক এবং নাখই-র মতে কাউকে জানাযা ছাড়া দাফন করা হয়েছে, এমন পরিস্থিতি ছাড়া এটি বৈধ নয়। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফি 'ওয়ারিস' এবং নিকটাত্মীয়দের জন্যই এটি বৈধ আখ্যা দিয়েছেন। কেননা জানাযায় অংশগ্রহণ করা তাদের জন্য অধিকার হিসেবে বর্তায়। (সহী বুখারী, ২য় খন্ড)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৭ই মে এপ্রিল, ২০২১ হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত জার্মানী, ২০১৪ (জুন)

মানুষ মরণশীল, মৃত্যু কখন এসে পৌঁছবে তা বলা বলা যায় না। জীবন ক্ষণস্থায়ী। তাই মানুষের জন্য আত্মসংশোধন এবং নিজের সমৃদ্ধির চিন্তায় মগ্ন হওয়া কতটা জরুরী!

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

খোদা তা'লা এবং বান্দার মধ্যে সম্পর্ক

বাটালার তেহসিলদার লালা কেশুদাস সাহেব হঠাৎ করে হযরত আকদস (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কাদিয়ানের ঝটিকা সফরে এসে পড়লেন। তিনি বললেন, 'পুণ্যাত্মাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমি উন্মুখ হয়ে থাকি। এই অনুরাগের কারণে আমি আপনার সমীপে উপস্থিত হয়েছি।' হযরত আকদস (আ.) বললেন: নিঃসন্দেহে, যদি আপনার হৃদয়ে শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষদের প্রতি অনুরাগ না থাকত, তবে আপনি আমার কাছে কেন আসতেন? একজন বস্তুবাদি মানুষের কি প্রয়োজন ছিল এমন এক ব্যক্তির কাছে আসার যে কি না জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক নিভৃত কোণে বসে থাকে? এর জন্য এক প্রকারের অনুরাগ আবশ্যক। বস্তুত মানুষ মরণশীল, মৃত্যু কখন এসে পৌঁছবে তা বলা বলা যায় না। জীবন ক্ষণস্থায়ী। তাই মানুষের জন্য আত্মসংশোধন করা এবং নিজের সমৃদ্ধির চিন্তায় মগ্ন হওয়া কতটা জরুরী! কিন্তু আমি দেখছি, জগতবাসী নিজের ধ্যানে এতটাই মগ্ন হয়ে আছে যে পরকালের কোন চিন্তাই নেই, খোদা তা'লা থেকে এমন উদাসীন হয়ে পড়ছে যেন খোদা বলে কোন সত্তাই নেই। আর যখন কিনা পৃথিবীর ঈমানী অবস্থা এমন দুর্বল হয়ে পড়েছে, আল্লাহ্‌ তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন, যাতে আমি জীবন্ত খোদার উপর জীবন্ত ঈমান সৃষ্টি করার পথ বলে দিই।

খোদার তা'লার সাধারণ নিয়ম, অনেকে যারা সৎ প্রকৃতি ও সঠিক পথ থেকে বঞ্চিত ছিল, যারা খোদাকে ভয় করত না আর ন্যায়নীতি থেকে সম্পূর্ণ রিক্ত হস্ত ছিল, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী, মিথ্যা রচনাকারী আখ্যা দিয়েছে। আর যাবতীয় উপায়ে আমাকে দুঃখ ও কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কুফর-এর ফতোয়া দিয়ে মুসলমানদেরকে আমার সম্পর্কে বিষিয়ে তুলতে চেয়েছে। আর আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা রিপোর্ট জমা দিয়ে সরকারকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে, মিথ্যা মোকাদ্দমা সাজানো হয়েছে, গালি দেওয়া হয়েছে, আমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে। মোটকথা আমার বিরুদ্ধে কোন কাজটি তারা করে নি? কিন্তু আমার খোদা সর্বদা আমার সঙ্গে থেকেছেন, তিনি আমাকে পূর্বাহ্নেই তাদের প্রত্যেক ফন্দি-ফিকির ও তার পরিণাম সম্পর্কে অবগত করেছেন। আর সেটিই হয়েছে যা অনেক পূর্বে তিনি আমাকে জানিয়ে রেখেছিলেন। আর কিছু মানুষ এমন আছে যারা পুণ্য প্রকৃতি, খোদা-ভীতি এবং ঈমানের জ্যোতি লাভে ধন্য হয়েছে, যাঁরা আমাকে চিনেছে আর সেই জ্যোতি লাভের জন্য আমার চতুর্পার্শ্বে একত্রিত হয়েছে যা খোদা তা'লা আমাকে স্বীয় অন্তর্দৃষ্টি ও ঐশী জ্ঞান হিসেবে দান করেছেন। এদের মধ্যে আছে বড় বড় আলেম, স্নাতক, উকিল, ডাক্তার, সরকারের সম্মানীয় পদাধিকারী, ব্যবসায়ী, জমিদার এবং সাধারণ মানুষও।

কিন্তু পরিতাপ, আমি যে সত্য উপস্থাপন করেছি অন্তত সেটুকু ঠান্ডা মাথায় শুনুক- এই অযোগ্য বিরুদ্ধবাদীরা এটুকুও করে না। এমন উচ্চ নৈতিকতা তাদের কাছে আশা করা যায় না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৯৯-৩০০)

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আল খামেস (আই.) প্রদত্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ-নির্দেশনা।

"আমি বারবার পিতামাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছি, সন্তানরা বাইরে কেমন পরিবেশে ওঠা-বসা করে তার প্রতিও দৃষ্টি রাখুন আর ঘরে যখন তারা টিভির প্রোগ্রাম দেখে বা ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করে তখনো সজাগ দৃষ্টি রাখুন।"

(খুতবা জুমআ, ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৩, বায়তুল ফুতুহ, লন্ডন)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৪ (জুন) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

৮ জুন, ২০১৪

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দুইজন অতিথি এসেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মি. স্টেফান হোসেল, যিনি কোলোন ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা বিজ্ঞানে পি.এইচ.ডি করছেন। তাঁর নিজের অধ্যায়ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই জামাতের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বর্তমানে তিনি যুবকদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পৃথিবীতে ধর্মের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে গবেষণা করছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ডক্টর নিলস কোবেল, যিনি মাইন্স ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষাকতার পাশাপাশি নিজের পোস্ট ডক্টরাল ডিগ্রিও করছেন। তিনি গবেষণা করছেন ধর্মে নৈতিক মূল্যবোধের বিষয় নিয়ে। হুযুর আনোয়ার উভয় অতিথির সঙ্গে কথোপকথন করেন।

ধর্মহীন নৈতিক মূল্যবোধের কোনও গুরুত্ব নেই আর এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবীদের প্রেরণ করে থাকেন, যাতে তাঁরা এই সব নৈতিক মূল্যবোধকে জীবিত রাখতে পারেন। এই কারণেই বিভিন্ন ব্যক্তিরা একই বাণী দান করেছেন আর আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে এই যুগের মসীহ ও মাহদী বানিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে প্রকৃত ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া মুসলমানদের সংশোধন করেন।

স্টেফান সাহেব বলেন, 'ধর্ম ছাড়াও নৈতিকতা থাকতে পারে।' প্রত্যুত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, হতে পারে, কিন্তু তা অত্যন্ত সীমিত, যেটুকু হয় তাও আবার ধর্মের অনুগ্রহেই। এই প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার মাও সেতুং এর উদাহরণ দিয়ে বলেন, এক পাকিস্তানী মন্ত্রী চীনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন এমন উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ তিনি কিভাবে ধারণ করেছেন? কোথা থেকে তিনি তা গ্রহণ করেছেন? মাওসেতুং তাকে উত্তর দিলেন, দেশে ফিরে গিয়ে কুরআন করীমের শিক্ষা এবং আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনী ভাল করে অধ্যয়ন কর। দেখবে উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ গ্রহণ করতে পারবে।

হুযুর আনোয়ার অতিথির আরও একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ইহুদী ধর্ম এবং খৃষ্টধর্মের শিক্ষা অনেকাংশেই সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে বহু মতবিরোধ দেখা যায়। এছাড়াও আসল সমস্যা হল, শিক্ষা তো আছে, কিন্তু তার বাস্তবায়ন হয় না। যেমন,তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে, পক্ষান্তরে সে সমগ্র জগতকে হত্যা করেছে। কিন্তু এই শিক্ষা কে কিভাবে মেনে চলছে? একই দশা মুসলমানদেরও। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে কুরআন করীমের শিক্ষা এবং আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করতে জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতাকে পাঠিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার তাঁদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এ রচনা 'ইসলামী নীতি দর্শন' অধ্যয়ন করার পরামর্শ দিলেন। যা শুনে অতিথিরা বলেন, শুরুতেই তাদেরকে এই বইটি দেওয়া হয়েছিল আর তারা এর কিছু কিছু অংশ পড়েওছেন। হুযুর আনোয়ার তাদেরকে এটি পুরোপুরি পড়তে বলেন।

ডক্টর নিলস কায়েবল পরম ভালবাসার আবেগ নিয়ে হুযুর আনোয়ারকে ফুল এবং চকলেট উপহার দেন। হুযুর আনোয়ার যেটি সাগ্রহে গ্রহণ করে তাদেরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি তাদেরকে কলম উপহার দেন।

ওয়াকফে নও কিশোরদের সঙ্গে ক্লাস। অনুষ্ঠানের বিষয় বস্তু ছিল 'আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব।

কুরআন করীমের তিলাওয়াত এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম সংবলিত আঁ হযরত (সা.)-এর একটি হাদীস উপস্থাপন করা হয় এবং এরপর হাদীসের উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, গুণবাচক নামগুলির অনুবাদের মধ্যে কিছু নাম এমনও আছে যেগুলির অর্থ ছেলেরা ঠিক মত বুঝতে পারবে না। তাদেরকে জার্মান ভাষায় বললে বেশি বুঝতে পারত। উর্দু শেখাতে হলে ছোট ছোট কথার মাধ্যমে শেখান। আর জটিল বিষয়গুলি তাদের নিজের ভাষায় শেখান।

অনুষ্ঠানের মূলপর্বের পর হুযুর আনোয়ার ক্লাসে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের সংখ্যা, বয়স ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। যার উত্তরে ওয়াকফে নও সেক্রেটারী বলেন, সারা জার্মানী থেকে ১২ থেকে ১৫ বছরের প্রায় তিনশ ওয়াকফে নও ছাত্র এই ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছে।

এরপর হুযুর আনোয়ার ছেলেদের জিজ্ঞাসা করেন যারা জামেয়ায় যেতে ইচ্ছুক, তার হাত তোল। অনেক ছেলে হাত তুলে জামেয়ায় যাওয়া ইচ্ছা ব্যক্ত করে। হুযুর আনোয়ার বলেন: এই পুরো ক্লাসটি চলে গেলে জামেয়া কর্তৃপক্ষকে নতুন করে আরও একটি ব্লক তৈরী করতে হবে। খুব ভাল কথা, মাশাআল্লাহ্॥ আপনারা এই সংকল্পে অবিচল থাকবেন। মাধ্যমিকের পর একথা যেন বলে বসো না যে তোমাদের ইচ্ছে পাল্টে গেছে, এখন অমুক ক্ষেত্রে যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। তাই ওয়াকফ করা এবং জামেয়ায় যাওয়ার অর্থ হল তোমাদেরকে যদি জার্মানী ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হয়, সেক্ষেত্রে প্রস্তুত থাকতে হবে।

একথা শুনে ছেলেরা একস্বরে বলল, 'আমরা সর্বত্র যেতে প্রস্তুত আছি।'

এক ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে Reil Schuee- এর পর আমরা জামেয়াতে ভর্তি হতে পারব কি? এটি দশম শ্রেণীর সমকক্ষ।

হুযুর আনোয়ার বলেন, দশম শ্রেণীর পর যদি তুমি কোয়ালিফাই করতে পারে আর জামেয়ায় ভর্তির যে মান নির্ধারিত আছে, তাতে উত্তীর্ণ হতে পার, উর্দুতে সাবলীল হও, কুরআন করীম পড়তে জান, আরবী জান, নামায জান, অনুবাদ করতে জান আর সর্বোপরি জামেয়ার লিখিত পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হও, তবে তো হয়েই গেল। কিন্তু এখানকার ছাত্রদের জার্মান ভাষাও জানা থাকা আবশ্যক। যদি তোমরা আবিটুর কর, তোমরা জার্মান ভাষায় সাবলীল হয়ে যাবে। এই কারণে জামেয়া কর্তৃপক্ষ আবিটুরকে অগ্রাধিকার দেয়। কিন্তু যদি তুমি মেধাবী হও, অন্য ভাষাও তোমাকে শেখানো যেতে পারে। যতগুলি হাত উপরে উঠেছে, এই সব মুবাল্লিগদের জার্মানীকেই যে দেওয়া হবে এমনটিও তো জরুরী নয়। অন্যান্য দেশেও তারা যাবে। তাদেরকে ফ্রেঞ্চ ভাষাও শেখাতে হবে, ফিলমিশ ও ইংলিশ, দুটিই শেখাতে হবে। আর অন্যান্য ভাষাও শেখাতে হবে। তাই যদি কোয়ালিফাই কর, তবে জামেয়ায় যেতে পার।

এক ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে বাড়িতে কোন পুরুষ যখন বা-জামাত নামায পড়ে, তখন মহিলারা তার পিছনে নামায পড়লেও পুরুষকেই কেন তকবীর দিতে হয়, মহিলারা কেন তকবীর দিতে পারে না?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: পুরুষ ইমামের পিছনে কেবল বাড়ির মহিলারা থাকলে তকবীর দিতে পারে।

একজন ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, রমযান মাসের রোযা রাখার বয়স কত বা কোন বয়সে রোযা রাখার অনুমতি পাওয়া যায়?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি স্বাস্থ্য ভাল হয়, তোমার মত হয়, তবে রোযা রাখতে পার। সহ্য করতে পারলে রোযা রাখ। কিন্তু গ্রীষ্মকালীন রোযা দীর্ঘ হয়ে থাকে, এক্ষেত্রে ছাত্রদেরকে সাবধনতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। তবে দু-একটি করে রোযা রেখে অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। সহ্য করতে পারলে কিছু কিছু রোযা রেখে অভ্যাস করা উচিত আর পরীক্ষার সময় হলে অবশ্যই বেশি চাপের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তাই সেই দিনগুলিতে রেখো না। কিন্তু যখন যুবকে পরিণত হও, সতেরো-আঠারো বছরে পদার্পণ কর, তখন সেটা তোমাদের জন্য আবশ্যিক হয়ে যায়।

কোন নির্দিষ্ট বয়স কোথাও উল্লেখ করা হয় নি। যাইহোক অভ্যাস করা উচিত। একেবারে বাল্যাবস্থায় বাচ্চাদেরকে রোযা রাখতে বলা উচিত নয়। অনেক মুসলমানেরা কম বয়সেই ছেলেদের রোযা রাখতে বলে। দীর্ঘ দিনগুলিতে ছেলেরা যখন তেষ্টায় ছটপট করে, তখন তাদেরকে ঘর বন্ধ করে আটকে রাখা হয়। পাকিস্তানে এমন অনেক ঘটনা

(এরপর ৯ পাতায়..)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

জুমআর খুতবা

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী(সা.) তিনবার এই দোয়া পড়ে তার বুকে হাত বুলিয়ে দেন যে, اَللّٰهُمَّ اَخْرِجْ مَا فِيْ صَدْرِهٖ مِنْ غِلٍّ وَّ أَبْدِلْهُ اِيْمَانًا , অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তার হৃদয়ে যে বিদ্বেষ-ই রয়েছে তা দূর করে দাও এবং একে ঈমানে পরিবর্তন করে দাও। এই দোয়া তিনি (সা.) ৩ বার করেন।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.)'র ঈমান আনার পূর্ব পর্যন্ত আমরা প্রকাশ্যে আল্লাহ্র ইবাদত করি নি।

আজ রমযানের শেষ জুমু'আ। এটিকে কেবল রমযানের শেষ জুমুআ হিসেবে পরিগণ্য করবেন না, বরং এ জুমুআ আমাদের জন্য ভবিষ্যতের নতুন পথ উন্মোচনকারী হওয়া উচিত। রমযানে যেসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে আর যেসব পুণ্যকর্ম করার সৌভাগ্য হয়েছে- তা রমযানের পরও আমাদের অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা উচিত, বরং এক্ষেত্রে আরো উন্নতি সাধন করা উচিত। অন্যথায় রমযান মাস অতিবাহিত করা আমাদের জন্য মূল্যহীন- যদি আমরা এই পুণ্যকর্ম এবং পবিত্র পরিবর্তনসমূহ ধরে না রাখি এবং এক্ষেত্রে উন্নতি সাধন না করি।

আমাদের স্কন্ধে এটি অনেক বড় একটি দায়িত্ব অর্পিত হয়, আমরা যেন নিজেদের ঈমানকে সুদৃঢ়করে, নিজেদের ব্যবহারিক কর্মের প্রতি দৃষ্টি রেখে, নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার মাধ্যম হই।

আমাদের কাজ হল দোয়া করা, দোয়া করা এবং দোয়া করতে থাকা, রমযান মাসে এবং রমযান মাসের পরেও। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ এবং اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ এই দোয়া দুটি অনেক বেশি করে পড়ুন।

আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করে ঈমানের উচ্চ মান অর্জন করার এবং নামায ও ইবাদতসমূহকে মানসম্মত করার এবং সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহ্র উপর দৃঢ় ঈমানের নেয়ামতে বিভূষিত করার উপদেশ।

কোরোনা মহামারি থেকে মুক্তি লাভের জন্য, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে যেখানে জামাতে আহমদীয়ার বিরোধিতা হচ্ছে, সেখানকার আহমদীদের জন্য, যাবতীয় অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং পুরো মুসলিম জাতি তথা সমগ্র মানবতার জন্য দোয়ার আহ্বান।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ৭ মে, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (৭ হিজরত, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছিল এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল। হযরত হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা হল, হযরত উমর (রা.) সর্বদা চরমভাবে ইসলামের বিরোধিতা করেছেন। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি ক্রমাগত ইসলামের বিরোধিতা করেছেন। একদিন তাঁর মনে ধারণা জন্মে যে, এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার ভবলীলা সাঙ্গ করে ফেললেই তো ভালো হয় আর এই ধারণা (মাথায়) আসতেই তিনি তরবারি হাতে তুলে নেন এবং মহানবী (সা.)-কে হত্যার মানসে বাড়ি থেকে বের হন। পথিমধ্যে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, উমর কোথায় যাচ্ছ? তিনি উত্তরে বলেন, মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করতে যাচ্ছি। সেই ব্যক্তি হেসে বলেন, 'আগে নিজের বাড়ির খবর নাও'। তোমার বোন ও ভগ্নিপতি তো তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, এটি মিথ্যা কথা। সেই ব্যক্তি বলল, নিজে গিয়ে দেখে নাও। হযরত উমর (রা.) সেখানে যান, (ঘরের) দরজা বন্ধ ছিল আর ভেতরে একজন সাহাবী (তখন) পবিত্র কুরআন পড়াচ্ছিলেন। তিনি (অর্থাৎ হযরত উমর) কড়া নাড়েন। ভেতর থেকে তাঁর ভগ্নিপতি জানতে চান, কে? উমর উত্তরে বলেন, (আমি) উমর। তারা যখন দেখেন, উমর এসেছেন আর তারা জানতেন যে, উমর (রা.) ইসলামের ঘোর বিরোধী, তাই যে সাহাবী কুরআন পড়াচ্ছিলেন তাকে কোথাও লুকিয়ে রাখেন। একইভাবে পবিত্র কুরআনের পৃষ্ঠাগুলোও কোন কোণায় লুকিয়ে ফেলেন- এরপর দরজা খুলেন। হযরত উমর (রা.) যেহেতু একথা শুনে এসেছিলেন যে, তারা অর্থাৎ তার বোন ও ভগ্নিপতি মুসলমান হয়ে গেছে। তাই তিনি এসেই জিজ্ঞেস করেন, দরজা খুলতে বিলম্ব করলে কেন? তাঁর ভগ্নিপতি উত্তরে বলেন, কিছুটা বিলম্ব তো হয়ই। হযরত উমর বলেন, বিষয় এটি নয়, কোন বিশেষ কারণ তোমাদের দরজা খুলতে বিলম্ব করিয়েছে? (আর) আমি শব্দও পাচ্ছিলাম যে, তোমরা সেই সাবীর কথা শুনছিলে। মক্কার মুশরিকরা মহানবী (সা.)-কে সাবী বলতো। তার ভগ্নিপতি কথা ঘুরানোর চেষ্টা করেন কিন্তু হযরত উমর (রা.) ক্ষুব্ধ হন আর তিনি তার ভগ্নিপতিকে প্রহার করার জন্য অগ্রসর হন। তার বোন স্বামীর প্রতি ভালোবাসার কারণে মাঝখানে এসে দাঁড়ান। হযরত উমর (রা.) যেহেতু হাত তুলে ফেলেছিলেন আর হঠাৎ তাঁর বোন মাঝখানে এসে পড়েছিলেন তাই তিনি আর নিজের হাতকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি, তাঁর হাত সজোরে তাঁর বোনের নাকে আঘাত করে আর সেখান থেকে রক্ত ঝরতে আরম্ভ করে। হযরত উমর (রা.) আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন। তিনি যখন দেখেন, আরবের রীতি বহির্ভূতভাবে তিনি মহিলার ওপর হাত তুলে ফেলেছেন, অর্থাৎ বোনের ওপর হাত তুলেছেন। (তাই) হযরত উমর (রা.) কথা ঘুরানোর জন্য বলেন, আচ্ছা আমাকে বল, তোমরা কি পড়ছিলে? বোন বুঝতে

পারেন, উমরের মাঝে কোমল অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই তিনি বলেন, যাও; তোমার মত মানুষের হাতে আমি সেই পবিত্র জিনিস দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নই। হযরত উমর (রা.) বলেন, তাহলে আমি করবো? বোন বলেন, সামনে পানি আছে– গোসল করে আসো তবেই সেই জিনিষ তোমার হাতে দেওয়া যেতে পারে। হযরত উমর (রা.) গোসল করে ফিরে আসেন। (তাঁর) বোন পবিত্র কুরআনের সেই পৃষ্ঠাগুলো যা তারা শুনছিলেন তা তাঁর হাতে তুলে দেন। হযরত উমর (রা.)'র মাঝে যেহেতু এক পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তাই কুরআনের আয়াত পাঠ করা মাত্রই তাঁর মাঝে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয় আর সেই আয়াতগুলো পাঠের পর তিনি অবলীলায় বলে ওঠেন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্। এই বাক্য শুনে সেই সাহাবীও বাইরে বেরিয়ে আসেন যিনি হযরত উমর (রা.)'র ভয়ে লুকিয়ে ছিলেন। এরপর হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, মহানবী (সা.) বর্তমানে কোথায় অবস্থান করছেন? মহানবী (সা.) সেদিনগুলোতে বিরোধিতার কারণে একের পর এক স্থান পরিবর্তন করছিলেন। তিনি বলেন, বর্তমানে তিনি দ্বারে আরকামে অবস্থান করছেন। হযরত উমর (রা.) তৎক্ষণাৎ সে অবস্থায়ই অর্থাৎ যেভাবে নগ্ন তরবারি তিনি (কাঁধে)ঝুলিয়ে রেখেছিলেন সেভাবেই সেই বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। বোনের হৃদয়ে গভীর আশঙ্কার সৃষ্টি হয় যে, কোথাও আবার তিনি মন্দ উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন না তো! তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত যেতে দিব না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে আশ্বস্ত না করবে যে, তুমি সেখানে কোন অপ্রীতিকর কাজ করবে না। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি দৃঢ় অঙ্গীকার করছি, আমি সেখানে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবো না। হযরত উমর (রা.) সেখানে পৌঁছেন– যেখানে মহানবী (সা.) অবস্থান করছিলেন। সেখানে গিয়ে কড়া নাড়েন। মহানবী (সা.) এবং সাহাবীরা (রা.) ভেতরে বসে ছিলেন, ধর্মীয় আলোচনা চলছিল। কোন এক সাহাবী জিজ্ঞেস করেন, কে? হযরত উমর (রা.) উত্তরে বলেন, আমি উমর। সাহাবীরা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! দরজা খোলা সমীচীন হবে না। কেননা, বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা রয়েছে। হযরত হামযাহ্ (রা.) সদ্য ঈমান আনয়ন করেছিলেন, তিনি যোদ্ধা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি বলেন, দরজা খুলে দাও। সে কী করে, আমি দেখব। অতএব, একজন গিয়ে দরজা খুলে দেয়। হযরত উমর (রা.) এগিয়ে আসলে মহানবী (সা.) তাকে বলেন, হে উমর! তুমি আর কতদিন আমার বিরোধিতা করতে থাকবে? হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি বিরোধিতার জন্য আসি নি, আমি তো আপনার দাসত্ব বরণ করতে এসেছি। যে উমর এক ঘণ্টা পূর্বেও ইসলামের চরম শত্রু ছিলেন এবং মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার অভিপ্রায়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন, এক নিমিষেই উন্নত মর্যাদার মু'মিন হয়ে যান। হযরত উমর (রা.) মক্কার কোন নেতা ছিলেন না কিন্তু বীরত্বের কারণে যুবসমাজের ওপর তাঁর বেশ ভালো প্রভাব ছিল। তিনি যখন মুসলমান হন তখন সাহাবীরা (রা.) আবেগের আতিশয্যে নারায়ে তাকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করেন। এরপর নামাযের সময় হলে মহানবী (সা.) নামায পড়তে চান তখন সেই উমর যিনি দু'ঘণ্টা পূর্বে মহানবী (সা.)-কে হত্যার মানসে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন, তিনি পুনরায় তরবারি বের করে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! খোদা তা'লার রসূল এবং তাঁর অনুসারীরা লুকিয়ে নামায পড়বে আর মক্কার মুশরিকরা বাইরে বুক ফুলিয়ে চলবে- এটা কীভাবে সম্ভব?আমি দেখবো যে,পবিত্র কাবাগৃহে আমাদেরকে নামায পড়তে কে বাধা দেয়। মহানবী (সা.) বলেন, এই আবেগ খুবই উত্তম কিন্তু পরিস্থিতি এখনো এমন যে, আমাদের বাইরে বের হওয়া সমীচীন নয়। "

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ: ১৪১-১৪৩)

কিন্তু এরপর পবিত্র কাবাগৃহে নামাযও পড়া হয় যেমনটি এর পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। এঘটনাটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'ও বর্ণনা করেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের মধ্যে কেবল দু'জনকেই যোদ্ধা বা বীরপুরুষ বলে মনে করা হত। একজন হলেন হযরত উমর (রা.) আর অপরজন, হযরত আমীর হামযাহ্ (রা.)। তারা দু'জনই যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তারা মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, আমরা ঘরের ভেতর লুকিয়ে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করবো- এটা আমরা পছন্দ করি না। কাবার প্রতি আমাদেরও অধিকার আছে তাই আমরা আমাদের অধিকার গ্রহণ না করার এবং প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র ইবাদত না করার কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। অতঃপর মহানবী (সা.) (যিনি) কাফিরদেরকে নৈরাজ্যের অপরাধ থেকে বাঁচানোর জন্য বাড়িতেই নামায পড়তেন, ইবাদতের উদ্দেশ্যে পবিত্র কাবাগৃহে যান। এসময় তাঁর একপাশে হযরত উমর (রা.) তরবারি উঁচিয়ে হাঁটছিলেন আর অপর পাশে হযরত আমীর হামযাহ্ (রা.)– আর এভাবে মহানবী (সা.) পবিত্র কাবাগৃহে প্রকাশ্যে নামায আদায় করেন। "

(খুতবাতে মাহমুদ, খন্ড-২৩, পৃ: ১০)

কুরাইশদের মাঝে যখন হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ করার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে তখন তারা চরম ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে এবং এই উত্তেজনার বশেই তারা হযরত উমর (রা.)'র বাড়ি অবরোধ করে। হযরত উমর (রা.) বাইরে আসেন। তাঁর (রা.) চতুর্দিকে লোকদের ভীড় জমা হয়। (তাদের মধ্যে) উত্তেজিত কেউ কেউ তাঁর (রা.) ওপর আক্রমণ করতেও উদ্যত ছিল। কিন্তু তিনি (রা.) বীরবিক্রমে তাদের সম্মুখে অবিচল থাকেন। এমতাবস্থায় মক্কার শীর্ষনেতা আ'স বিন ওয়ায়েল সেখানে এসে এত মানুষের জটলা দেখে স্বীয় নেতাসুলভ ভঙ্গীতে বলেন, কী হয়েছে? লোকেরা বলে, উমর সাবী হয়ে গিয়েছে। সেই নেতা সুযোগ বুঝে বলল, ঠিক আছে, এমনটি হলেও দাঙ্গা-হাঙ্গামার কোন প্রয়োজন নেই। উমরকে আমি আশ্রয় দিচ্ছি। এ কথার প্রেক্ষিতে আরবের রীতি অনুসারে জনতাকে নীরবতা অবলম্বন করতে হয় এবং ধীরে ধীরে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এরপর হযরত উমর (রা.) বেশ কিছুদিন নিরাপদেই থাকেন কেননা, আ'স বিন ওয়ায়েলের নিরাপত্তার কারণে কেউ তার সাথে সংঘাতে জড়াত না। কিন্তু হযরত উমর (রা.)'র আত্মাভিমান খুব বেশি দিন পর্যন্ত এই অবস্থাকে মেনে নিতে পারে নি। তাই অল্প কয়েক দিন যেতে না যেতেই তিনি (রা.) আ'স বিল ওয়ায়েলকে গিয়ে বলেন যে, আমি তোমার আশ্রয় থেকে মুক্ত হচ্ছি। হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, এরপর আমি মক্কার অলি-গলিতে কেবল মার খেতাম নইলে মারতাম অর্থাৎ মানুষের সাথে মারামারি বা সংঘাত লেগেই থাকত কিন্তু হযরত উমর (রা.) কখনো কারো সামনে দৃষ্টি অবনত করেন নি।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ১৫৯, প্রণেতা: মির্যা বশীর আহমদ এম.এ.)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, দেখ! মহানবী (সা.)-এর কেমন ঘোরতর শত্রু ছিল কিন্তু ঈমান আনার পর তাদের মাঝে কীরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। তাদের কেবল সংশোধনই হয়নি বরং তাঁরা (রা.) আধ্যাত্মিকতার এমন উন্ন ত মার্গে উপনীত হয়েছিলেন যে, তাদেরকে চেনাও দুষ্কর হয়ে পড়ে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, (যে কারণে) চেনাই যেত না যে, এরাই তারা। হযরত উমর (রা.) ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছড়ি নিয়ে ঘুরতেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন তখন তাঁর (রা.) মাঝে এমন এক পরিবর্তন সাধিত হয় যে, ধর্মের খাতিরে নিজ প্রাণ বিপদের মুখে ঠেলে দেন আর দিনরাত ইসলাম সেবায় রত হন। "

(তফসীর কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৫)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হযরত উমর (রা.)'র প্রতিই লক্ষ্য করে দেখ! তাঁর (রা.) মাধ্যমে ইসলামের কত কল্যাণ সাধিত হয়েছে। এক যুগে তিনি (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন নি আর চার চারটি বছর বিলম্বিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা খুব ভালো জানেন, এর নেপথ্যে কি প্রজ্ঞা বা রহস্য ছিল। আবু জাহল এমন কোন ব্যক্তিকে সন্ধান করছিল যে মহানবী (সা.)-কে হত্যা করতে পারে। তখন হযরত উমর (রা.) শৌর্য ও বীরত্বের কারণে সুপরিচিত ছিলেন। তারা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রে একমত হয় আর চুক্তিপত্রে হযরত উমর (রা.) এবং আবু জাহল স্বাক্ষর করে। চুক্তিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, উমর যদি {মহানবী (সা.)-কে} হত্যা করতে পারে তাহলে তাকে এই পরিমাণ অর্থ দেওয়া হবে। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কুদরত ও লীলা দেখ! সেই উমর (রা.) যিনি মহানবী (সা.)-কে এক সময় শহীদ করার উদ্দেশ্যে বের হয় পক্ষান্তরে সেই একই উমর মুসলমান হয়ে স্বয়ং শহীদ হয়ে যান। কত অদ্ভুত ছিল সেই যুগ! মোটকথা তখন এই চুক্তি হয়েছিল, (উমর বলেন) আমি তাঁকে হত্যা করব। এই লিখিত চুক্তির পর মহানবী (সা.)-কে হত্যার দুরভিসন্ধি নিয়ে তাঁর সন্ধানে হযরত উমর (রা.) রাতের আঁধারে ঘুরে

বেড়াতেন, কোথাও একাকী বা নির্জনে পাওয়া গেলে মহানবী (সা.)-কে হত্যা করবেন। লোকজনকে তিনি (রা.)জিজ্ঞেস করেন, মুহাম্মদ (সা.)-কে একাকী কোথায় পাওয়া যাবে? লোকেরা বলে, মুহাম্মদ (সা.) মাঝ রাতের পর পবিত্র কাবাগৃহে গিয়ে নামায পড়েন। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) খুবই আনন্দিত হন। তাই, তিনি কাবাগৃহে এসে ওঁত পেতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর নির্জন জঙ্গল থেকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" ধ্বনি শুনতে পান। আর তা মুহাম্মদ (সা.)-এরই ধ্বনী ছিল। এই শব্দ শুনে এবং এটি বুঝতে পেরে যে, তিনি (সা.) এদিকেই আসছেন, হযরত উমর (রা.) আরো সতর্কতার সাথে লুকিয়ে পড়েন এবং এই পণ করেন যে, তিনি (সা.) সিজদায় গেলেই তরবারি দিয়ে তাঁর দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করে ফেলবেন। মহানবী (সা.) এসেই নামায পড়া শুরু করেন। এরপরের ঘটনা হযরত উমর (রা.) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এরপরের ঘটনা হযরত উমর (রা.) নিজেই বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) সিজদায় এমনভাবে কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন যে, আমি শিউরে উঠতে থাকি, কাঁপতে থাকি। দোয়াতে তিনি (সা.) আরো বলেন, সাজাদা লাকা রুহী ওয়া জেনানী। অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আমার আত্মা এবং আমার অন্তরও তোমায় সিজদা করেছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, এসব দোয়া শুনে (ভয়ে) আমার কলিজা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে সত্যের প্রতাপের দরুন আমার হাত থেকে তরবারি পড়ে যায়। মহানবী (সা.)-এর এই অবস্থা দেখে আমি অনুধাবন করি, তিনি সত্য আর অবশ্যই তিনি সফল হবেন। কিন্তু নফসে আম্মারা বা অবাধ্য আত্মা খারাপ হয়ে থাকে। সে বার বার প্ররোচিত করে। তিনি (সা.) নামায পড়ে বের হলে আমি তাঁর পিছু নিই। (আমার) পদধ্বনিতে মহানবী (সা.) বুঝতে পারেন। রাত অন্ধকার ছিল। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কে? উত্তরে আমি বলি, আমি উমর। তিনি (সা.) বলেন, হে উমর! দিন-রাত কখনোই তুমি আমার পিছু ছাড় না? তখন আমি মহানবী (সা.)-এর আত্মার সুবাস পাই আর আমার আত্মা অনুভব করে, তিনি (সা.) (আমার বিরুদ্ধে) বদদোয়া করবেন। আমি নিবেদন করি, মহাত্মন! বদদোয়া করবেন না যেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, সেই ক্ষণটি আমার জন্য ইসলাম (গ্রহণের) সময় ছিল, অবশেষে খোদা তা'লা আমাকে মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮০-১৮১)

এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি আর এরই বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে কিছুটা বিরতির পর তিনি (আ.) আরেক স্থানে বর্ণনা করেছেন। সেগুলোও একই কথা কিন্তু তাতে শেষের দিকে দু'একটি শব্দ ভিন্ন উপসংহার বের করেছে। তিনি (আ.) বলেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত উমর (রা.) আবু জাহলের সাথে দেখা সাক্ষাত করতেন। বরং লেখা আছে, আবু জাহল একবার মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে আর এজন্য পুরস্কার স্বরূপ কিছু অর্থও ঘোষণা করে। এই কাজের জন্য হযরত উমর (রা.) নির্বাচিত হন। অতএব তিনি তার তরবারিতে শাণ দেন এবং সুযোগের সন্ধানে থাকেন। অবশেষে হযরত উমর (রা.) জানতে পারেন, মাঝ রাতে কা'বাগৃ হে এসে তিনি (সা.) নামায পড়েন। তাই তিনি কা'বাগৃহে এসে লুকিয়ে থাকেন আর তিনি শুনতে পান, জঙ্গলের দিক থেকে লা ইলাহা ধ্বনি ভেসে আসছে, এভাবে সেই শব্দ নিকটবর্তী হতে থাকে এবং মহানবী (সা.) এসে কা'বাগৃহে প্রবেশ করেন আর এরপর তিনি (সা.) নামায পড়েন। হযরত উমর (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) সিজদায় গিয়ে এত বেশি দোয়া করেন যে, আমার মাঝে তরবারি চালানোর মত আর সাহস অবশিষ্ট ছিল না। তিনি (সা.) নামায শেষ করে সামনের দিকে হাঁটতে থাকেন আর আমি পিছু পিছু চলতে থাকি। আমার পদধ্বনি শুনতে পেয়ে মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কে? আমি উত্তরে বলি, আমি উমর। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, হে উমর! দিনের বেলায়ও আমার পিছু ছাড় না আর রাতের বেলাও না? হযরত উমর (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর একথা শুনে আমি অনুভব করি , তিনি (সা.) (হয়তো) বদদোয়া করবেন। তাই আমি নিবেদন করি, হযরত! আজকের পর আমি আপনাকে আর কষ্ট দিব না। আরবদের মাঝে যেহেতু অঙ্গীকার রক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হয়, তাই মহানবী (সা.) (আমার কথা) বিশ্বাস করেন। কিন্তু আসলে হযরত উমর (রা.)'র জন্য মাহেন্দ্রক্ষণ সন্নিকটে ছিল। এ প্রসঙ্গে এই কথাগুলো কিছুটা নতুন। এতে মহানবী (সা.) মনে মনে ভাবেন, তাকে আল্লাহ্ বিনষ্ট করবেন না। অতএব, অবশেষে হযরত উমর (রা.) মুসলমান হন আর এরপর সেই বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্ক যা আবু জাহল এবং অন্যান্য বিরোধীর সাথে ছিল তা এক নিমিষে ভেঙ্গে যায় আর সেই স্থলে এক নতুন ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপিত হয়। হযরত আবু বকর (রা.) এবং অন্য সাহাবীদের পাওয়ার পর পূর্বের সেই সম্পর্কের কথা আর কখনো মনেও পড়ে নি।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪০)

একস্থানে হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি তিনি (আ.) সেই একই আঙ্গিকে বর্ণনা করেন, সামান্য কিছু শব্দে হয়তো ভিন্নতা রয়েছে। তিনি (আ.) বলেন,মহানবী (সা.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে হযরত উমর (রা.)'র যাওয়ার ঘটনা আপনারা শুনে থাকবেন। আবু জাহল জাতির মধ্যে এক প্রকার বিজ্ঞাপন দিয়ে রেখেছিল, অর্থাৎ যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-কে হত্যা করবে সে অনেক অনেক পুরস্কার ও সম্মান লাভের যোগ্য হবে। ইসলামগ্রহণের সৌভাগ্য লাভের পূর্বে হযরত উমর (রা.) আবু জাহলের সাথে চুক্তি করেছিলেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করতে সম্মত হয়েছিলেন। তিনি কোন মোক্ষম সুযোগের সন্ধানে ছিলেন। খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) মধ্যরাতে কা'বাগৃহে নামায পড়ার জন্য আসেন। এটিকে উপযুক্ত সময় ভেবে হযরত উমর সন্ধ্যার দিকে কা'বা শরীফে গিয়ে লুকিয়ে থাকেন। মাঝরাতে জঙ্গল থেকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' শব্দ ভেসে আসতে থাকে। হযরত উমর (রা.) ঠিক করেন, যখন মহানবী (সা.) সিজদায় যাবেন তখনই হত্যা করব। মহানবী (সা.) গভীর বেদনার সাথে প্রার্থনা আরম্ভ করেন এবং সিজদায় এমনভাবে আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন যে, হযরত উমরের মন গলে গেল, তার সব উদ্যম লোপ পেতে থাকে এবং তার হত্যার জন্য উদ্যত হাত শিথিল হয়ে যায়। হযরত উমর (রা.)'র কোমলতার কথা বলতে গিয়ে তিনি (আ.) এভাবে বর্ণনা করেছেন। নামায শেষ করে মহানবী (সা.) যখন বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন হযরত উমর (রা.)ও তাঁর পেছনে পেছনে যেতে থাকেন। মহানবী (সা.) পদধ্বনি শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, কে তুমি? (কে পিছনে তা) জানার পর তিনি (সা.) বলেন, হে উমর! তুমি কি আমার পিছু ছাড়বে না? হযরত উমর (রা.) তখন বদদোয়ার ভয়ে বলেন, মহোদয়! আমি আপনাকে হত্যার সংকল্প পরিত্যাগ করেছি। আমার বিরুদ্ধে বদদোয়া করবেন না। হযরত উমর (রা.) বলতেন, এটিই সেই প্রথম রাত ছিল যখন আমার মাঝে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা জন্মে।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৬১)

আমি পৃথক তিনটি উদ্ধৃতি পড়লাম, এটি শুধু একথা বলার জন্য যে, একটি হল ১৯০১ সালের জানুয়ারি মাসের, একটি ১৯০২ সালের আগস্ট মাসের এবং একটি ১৯০৪ সালের জুন মাসের কিংবা সম্ভবত ১৯০৭ সালের। যাহোক, এই তিন স্থানেই তিনি (আ.) রাতের বেলা কা'বা শরীফে আক্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ঘটনার পর সম্ভবত প্রবৃত্তির তাড়নায় পরাভূত হয়ে আবার তিনি (রা.) দিনের বেলায়ও বেরিয়ে থাকবেন, যখন ভাইবোনের সেই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল যা সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু যাহোক, তিনবারই তিনি (আ.) এটি বলেছেন। কেননা তিনি নফসে আম্মারা'র কথাও উল্লেখ করেছেন; হতে পারে আবার তার মধ্যে কুপ্ররোচনা সৃষ্টি হয়েছিল এবং তখন তিনি (হত্যার উদ্দেশ্যে) বের হয়েছিলেন। আর দু'টি ঘটনাতেই তা হোক ভাইবোন বা ভগ্নিপতি সংক্রান্ত ঘটনা কিংবা রাতের বেলা হত্যাচেষ্টার ঘটনা, তাতে নিশ্চিতভাবে একথার উল্লেখ রয়েছে যে, আবু জাহলের উস্কানিতে এবং তার পুরস্কার ঘোষণার ফলেই হযরত উমর (রা.) এই সংকল্প করেছিলেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আবু জাহলকে ফেরাউন বলা হয়েছে, কিন্তু আমার মতে সে ফেরাউনের চেয়েও জঘন্য ছিল। ফেরাউন তো অবশেষে বলেছিল, اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآءِیْلَ [আমি ঈমান আনছি যে, সেই সত্তা ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, যার প্রতি বনি ইস্রাঈল ঈমান এনেছে। (সূরা ইউনুস: ৯১)] কিন্তু এ (আবু জাহল) শেষ পর্যন্ত ঈমান আনে নি। মক্কায় সমস্ত নৈরাজ্যের সে-ই হোতা ছিল আর সে চরম অহংকারী, স্বার্থ পর এবং সম্মান ও খ্যাতিলোভী লোক ছিল। তার আসল নামও আমর ছিল আর এই উভয় উমর-ই মক্কায় বাস করতো। খোদার প্রজ্ঞা এক উমরকে কাছে টানেন আর অপরজন বঞ্চিত থাকে, তার আত্মা সম্ভবত দোযখে পুড়ছে আর হযরত উমর (রা.) হঠকারিতা পরিত্যাগ করায় বাদশাহ্ হয়ে গেছেন।" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ২৪৭)

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী(সা.) তিনবার এই দোয়া পড়ে তার বুকে হাত বুলিয়ে দেন যে, ***' আল্লাহুম্মা আখরিজ মা ফি সাদরিহি মিন গিল্লিন ওয়াবদিলহু ঈমানা'***, অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তার হৃদয়ে যে বিদ্বেষ-ই রয়েছে তা দূর করে দাও এবং একে ঈমানে পরিবর্তন করে দাও।এই দোয়া তিনি (সা.) ৩ বার করেন। (আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩য় ভাগ, পৃ: ২৩৭)

যেমনটি আমরা হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের পূর্বের জীবনে দেখেছি যে, মুসলমান হওয়ার পূর্বে হযরত উমর (রা.) মুসলমানদের চরম বিরোধী ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার ইসলাম গ্রহণ মুসলমানদের জন্য বিজয় এবং সংকট থেকে উত্তরণের কারণ প্রমাণিত হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.)'র ঈমান আনার পূর্ব পর্যন্ত আমরা প্রকাশ্যে আল্লাহ্র ইবাদত করি নি।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ ভাগ, পৃ: ৪৮৪)

হযরত আব্দুর রহমান বিন হারিস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) বলেন, যে রাতে আমি ইসলাম গ্রহণ করি সেদিন আমি ভাবলাম, মক্কাবাসীদের মধ্যে মহানবী (সা.)-এর শত্রুতায় সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী কে? আমি তার কাছে গিয়ে তাকে বলব, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার কাছে মনে হল, সে আবু জাহলই হবে। এরপর হযরত উমর (রা.) বলেন, সকাল হতেই আমি তার বাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ি। তিনি (রা.) বলেন, আবু জাহল আমার কাছে এসে বলে, হে আমার ভাগ্নে! স্বাগতম। হযরত উমর (রা.)-কে সে বলে, স্বাগতম। তুমি কি মনে করে এসেছ? হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি বললাম, আমি তোমাকে একথা বলতে এসেছি; আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছি। এছাড়া তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন আমি তার সত্যয়ন করেছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, একথা শুনে সে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয় আর বলে, আল্লাহ্ তোমাকে এবং সেই জিনিসকে ধ্বংস করুন যা তুমি এনেছ।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ১৬২)

এটি ছিল আবু জাহলের বাক্য।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমার পিতা হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর লোকদের জিজ্ঞেস করেন, কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কথা রটানোর বা প্রচারের অভ্যাস কার মাঝে রয়েছে? তারা বলে, জামিল বিন মা'মার জুমহী। হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, তিনি (রা.) প্রত্যুষেই তার কাছে চলে যান আর আমিও তাঁর পিছনে পিছনে যাই। আমি দেখতে চাইছিলাম যে, তিনি কী করেন? ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমি অল্প বয়স্ক হলেও যা কিছু দেখতাম তা বুঝতে পারতাম। হযরত উমর (রা.) তার কাছে গিয়ে তাকে বলেন, হে জামিল! তুমি কি জানো আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি আর মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মে অন্তর্ভুক্ত হয়েছি? হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম! তিনি একথার পুনরাবৃত্তি করেন নি, অর্থাৎ দ্বিতীয়বার বলার প্রয়োজন পড়ে নি, ইতিমধ্যে সে তার চাদর গুটাতে গুটাতে বের হয়ে যায় আর হযরত উমর (রা.)ও তার পিছু নেন। হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমিও আমার পিতার পিছনে পিছনে যেতে থাকি। যেতে যেতে সে, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি জামিল কা'বা শরীফের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলতে থাকে, হে কুরাইশের দল! (কা'বার দরজায় দাঁড়িয়ে সে এটি ঘোষণা করে,) হে কুরাইশের দল! আর লোকেরা তখন কা'বা শরীফের পাশে নিজ নিজ আসরে বসে ছিল, তারা তার প্রতি দৃষ্টি দেয়। তখন সে বলে, তোমরা শুনে নাও! উমর বিন খাত্তাব সাবী হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উমর (রা.) তার পিছন থেকে বলছিলেন, সে মিথ্যা বলছে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। সাবী হই নি, বরং আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি আর এই কথার সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। একথা শুনে কুরাইশরা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর তাদের সাথে তিনি লড়তে থাকেন। অর্থাৎ তাদের মাঝে লড়াই হয় আর এভাবে দুপুর পর্যন্ত চলতে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (রা.) ক্লান্ত হয়ে পড়েন। অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েন আর মানুষ তাকে ঘিরে ধরে। তখন তিনি (রা.) বলছিলেন, তোমরা যা খুশি কর, আমি আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছি, আমরা তিনশ' পুরুষ হয়ে গেলে হয় আমরা একে, অর্থাৎ মক্কাকে তোমাদের জন্য ছেড়ে দিব নয়তো তোমরা একে আমাদের জন্য ছেড়ে দিবে। অর্থাৎ এরপর আমরা স্বাধীনভাবে সব কিছু করব। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের এই অবস্থায়-ই কুরাইশদের মধ্য থেকে এক বয়স্ক ব্যক্তি আসে, যে ইয়েমেনী কাপড়ের একটি নতুন পোশাক এবং নকশা করা জামা পরিহিত ছিল। সে তাদের কাছে এসে দাঁড়ায় এবং বলে, তোমাদের কী হয়েছে? তারা বলে, উমর 'সাবী' বা ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। সেই ব্যক্তি বলে, তাতে কী হয়েছে। এক ব্যক্তি নিজের জন্য একটি বিষয় বেছে নিয়েছে, তোমরা কী চাও? তোমরা কি মনে কর যে, বনু আদী বিন কা'ব (গোত্র) তাদের সদস্যকে এমনিতেই তোমাদের হাতে ছেড়ে দিবে? এই ব্যক্তিকে ছেড়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, খোদার কসম! অতঃপর তারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে সরে যায়। হযরত ইবনে উমর, অর্থাৎ হযরত উমরের পুত্র বলেন, আমি আমার পিতাকে, অর্থাৎ হযরত উমরকে জিজ্ঞেস করি, যখন তিনি মদীনায় হিজরত করেছিলেন, অর্থাৎ মদীনায় হিজরতের বহুদিন পর তাকে জিজ্ঞেস করি যে, হে আমার পিতা! সেই ব্যক্তি কে ছিল, যে মক্কায় আপনার ইসলাম গ্রহণের দিন মানুষকে ভর্ৎসনা করে আপনার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, যখন তারা আপনার সাথে লড়াই করছিল? তিনি বলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! সে ছিল আ'স বিন ওয়ায়েল সাহ্মী।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ১৬১-১৬২)

বুখারীতেও একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত উমর (রা.) নিজের বাড়িতে ভীত-ত্রস্ত হয়ে বসেছিলেন, তখন আবু আমর আ'স বিন ওয়ায়েল সাহ্মী আসে আর সে একটি নকশা করা চাদর এবং একটি রেশমী পাড় দেওয়া জামা পরিহিত ছিল। আর সে ছিল বনু সাহ্ম গোত্রের সদস্য, যারা অজ্ঞতার যুগে আমাদের মিত্র ছিল। আ'স হযরত উমর (রা.)-কে বলে, তোমার এ কী অবস্থা? হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমার জাতি চায়- আমি যেহেতু মুসলমান হয়ে গেছি তাই তারা আমাকে হত্যা করবে। সে বলে, তোমার কাছে কেউ পৌঁছতে পারবে না। এতে আমি আশ্বস্ত হই। আ'স এই কথা বলে চলে যায় আর মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করে। তখন পরিস্থিতি এরূপ ছিল যে, মক্কা উপত্যকা তাদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। আ'স জিজ্ঞেস করে, (তোমরা) কোথাও যাচ্ছ? তারা উত্তরে বলে, আমরা খাত্তাবের সেই পুত্রের কাছে যাচ্ছি যে ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে। সে বলে, তার কাছে যেও না। একথা শুনে মানুষ ফিরে যায়। হযরত উমর (রা.)'র ভীত-ত্রস্ত হওয়ার যে কথা এই রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তা সঠিক বলে মনে হয় না, কেননা এটি হযরত উমরের প্রকৃতি বিরোধী। হতে পারে যে, দুশ্চিন্তার ছাপ ছিল, যা বর্ণনাকারী ভয় মনে করেছেন, অথবা এমনিতেই, যেমনটি পূর্বেও একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, কিছুকাল পর হযরত উমর(রা.)সেই আশ্রয় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আর এর উল্লেখ পরবর্তীতেও আসবে। হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের রেওয়ায়েত সমূহের ব্যাখ্যায় আ'স বিন ওয়ায়েল সাহ্মী-র উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব লিখেন যে,

হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কতিপয় লোক, যারা ঈমান এনেছিলেন, তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনের কথাও উল্লেখ রয়েছে এবং বলা হয়েছে, হযরত উমরও মুসলমান হওয়ার কারণে কঠোরতার শিকার হতেন যদি আ'স বিন ওয়ায়েল সাহ্মী তাকে নিজের আশ্রয়ে নেওয়ার ঘোষণা না করত। আস বিন ওয়ায়েল কুরাইশদের সম্মানীত ব্যক্তিদের একজন ছিল আর বনু সাহ্ম গোত্রের সদস্য ছিল। তার বংশধারা হল আস বিন ওয়ায়েল বিন হাশেম বিন সাঈদ বিন সাহ্ম। হিজরতের পূর্বে কাফির অবস্থাতেই সে মৃত্যু বরণ করেছিল। আর হযরত উমর (রা.) ছিলেন বনু আদী গোত্রের সদস্য। বনু আদী ও বনু সাহ্ম গোত্র পরস্পরের মিত্র ছিল। আর উক্ত চুক্তি, মৈত্রী ও সমর্থনের কারণে আ'স বিন ওয়ায়েল হযরত উমর (রা.)'র সাহায্য করাকে নিজের নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করত।

(সহী আল বুখারী (অনুদিত), কিতাবু মানাকিবুল আনসার, বাব ইসলাম উমর ইবনুল খাত্তাব,৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৬-৩৪৭)

যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, হযরত উমর (রা.) এক সময় আস বিন ওয়ায়েল-এর আশ্রয় পরিত্যাগ করেছিলেন। অতএব, এ সম্পর্কে হযরত উমর (রা.)স্বয়ং বর্ণনা করেন, কোন মুসলমানকে প্রহৃত অবস্থায় দেখব আর আমাকে প্রহার করা হবে না- এটি দেখা আমি পছন্দ করি নি। তিনি (রা.) বলেন, আমি চিন্তা করলাম- এটি কোন কথা নয়; (তাই)আমারও

সেই কষ্টই পাওয়া উচিত যা অন্য মুসলমানরা পাচ্ছে। তিনি বলেন, (কিন্তু) আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বিরত থাকি যতক্ষণ না তারা কাবাগৃহে সমবেত হয়। আমি আমার মামা আ'স বিন ওয়ায়েল-এর নিকট যাই এবং বলি, আপনি আমার কথা শুনুন। তিনি বলেন, আমি কী কথা শুনবো? তিনি (রা.) বলেন, আমি বললাম, আমি আপনার আশ্রয় আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, একথা শুনে তিনি বলেন, হে আমার ভাগ্নে! তুমি এমনটি করো না। তখন আমি বললাম, ব্যাস! এটাই আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন, ঠিক আছে, তুমি যেমনটি চাও তাই হবে। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি আশ্রয় ফিরিয়ে দেওয়ার পর থেকে কেবল মার খেতে থাকি এবং মারতে থাকি, অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামকে সম্মানিত করেন।

(উসদুল গাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৪১)

মুহাম্মদ বিন উবায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমার স্পষ্ট মনে আছে, হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত আমরা বায়তুল্লাহ্ শরীফে নামায পড়তে পারতাম না। হযরত উমর (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি সেই কাফিরদের সাথে লড়াই করেন, অবশেষে তারা আমাদেরকে বাধা প্রদানে ক্ষান্ত হয় এবং আমরা সেখানে নামায পড়তে আরম্ভ করি। (আত্তাবাকাতুল কুবররা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪৩)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমরা সম্মানের সাথেই জীবনযাপন করেছি। (সহী বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাব, হাদীস-৩৬৮৪)

পরবর্তীতেও অত্যাচার অব্যাহত ছিল, কিন্তু পূর্বেকার অন্যায়-অত্যাচারের তুলনায় তারা সেসব অত্যাচারকে কষ্ট মনে করতেন না। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, হযরত উমর (রা.)-কেও নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হিশাম (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। তিনি (সা.) হযরত উমর (রা.)'র হাত ধরে রেখেছিলেন। হযরত উমর (রা.) তাঁকে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি আমার নিকট সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয়, কেবল আমার প্রাণ ব্যতীত। মহানবী (সা.) বলেন, না, সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ আছে, তোমার ঈমান ততক্ষণ পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ তোমার প্রাণের চেয়েও আমি তোমার কাছে প্রিয় না হব। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হযরত উমর (রা.) তাঁর (সা.) সমীপে নিবেদন করেন, আল্লাহ্র কসম! এখন থেকে আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। এটি শুনে তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ উমর! এখন ঠিক আছে। (সহী আল বুখারী, কিতাবুল ঈমান ওয়াননাযুর, হাদীস-৬৬৩২) এই ছিল ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ।

হযরত উমর (রা.)'র মদীনায় হিজরতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.) আমাকে বলেন, আমি মুহাজিরদের মধ্যে এমন কাউকে চিনি না যে-কিনা লুকিয়ে হিজরত করে নি, কেবল হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) ব্যতিরেকে। তিনি (রা.) যখন হিজরত করার সংকল্প করেন তখন তরবারি নেন, ধনুক কাঁধে ঝুলান আর তির এবং বর্শা হাতে নিয়ে কা'বার দিকে অগ্রসর হন। কুরাইশ সর্দাররা কা'বা চত্বরেই ছিল। তিনি (রা.) অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে কা'বার চারপাশে সাতবার তওয়াফ করেন। এরপর মাকামে ইব্রাহীমে যান এবং সেখানে প্রশান্ত চিত্তে নামায পড়েন। অতঃপর তিনি এক এক করে প্রতিটি গোত্রের নিকট গিয়ে বলেন, তোমাদের চেহারা বিকৃত হোক এবং আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের নাক ধূলোমলিন করুন। আর যে ব্যক্তি চায় যে, তার মা সন্তানহারা হোক, তার সন্তানরা এতীম হোক এবং তার স্ত্রী বিধবা হোক, সে যেন এই উপত্যকার ওপারে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে। হযরত আলী (রা.) বলেন, কয়েকজন দুর্বল প্রকৃতির মুসলমান ব্যতীত কেউই তাঁর পশ্চাদনুসরণ করে নি। তিনি তাদেরকে তথ্য সরবরাহ করেন এবং তাদেরকে পথ দেখিয়ে দেন। এরপর তিনি নিজের পথে অগ্রসর হন।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৪৮-৬৪৯)

হযরত উমর (রা.)'র এভাবে প্রকাশ্যে হিজরত করা সম্পর্কে হযরত আলী (রা.) বর্ণনাকৃত এই একটি রেওয়ায়েতই রয়েছে যা উল্লেখ করা হয়ে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ জীবনীকাররা এটি থেকে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেন। মুহাম্মদ হোসেন হেইকল নামক এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা.)'র বর্ণাঢ্য জীবনী সম্বলিত একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি তাতে এই বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, মহানবী (সা.) হিজরতের নির্দেশ দেওয়ার সময় বলেছিলেন, নীরবে, নিভৃতে ও লুকিয়ে মক্কা থেকে বের হবে, যাতে বিরুদ্ধবাদীরা জানতে না পারে, নতুবা তারা বাধা দিবে এবং তোমাদেরকে আরো কষ্ট দিবে। মহানবী (সা.)-এর এমন সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও হযরত উমর (রা.) কীভাবে তা অমান্য করতে পারেন! এছাড়া এর পাশাপাশি তাবাকাত ইবনে সা'দ এবং ইবনে হিশাম-এ স্পষ্টভাবে লেখা আছে, হযরত উমর (রা.)ও অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় গোপনেই হিজরত করেছিলেন। যাহোক, যদি হযরত আলী (রা.)'র বর্ণনাকে কোনভাবে সঠিক আখ্যায়িত করতেও হয় তাহলে হতে পারে কোন এক সময় দাঁড়িয়ে তিনি এই ঘোষণা করেছিলেন; কিন্তু সে সময় হিজরত করেন নি। অর্থাৎ কা'বাতে দাঁড়িয়ে নেতাদের সামনে যখন ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আমি যাচ্ছি, পারলে আমাকে ঠেকিয়ে দেখাও; তখন হিজরত করেন নি। আর যখন হিজরতের পরিকল্পনা করা হয় তখন তিনি নীরবে হিজরত করেন। যাহোক, হেইকল এর এ কথাটি নিজের মাঝে গুরুত্ব বহন করে। আর যেমনটি আমি বলেছি, তাবাকাত ইবনে সা'দ ও ইবনে হিশামও তা-ই লিখেছেন। এটিই মনে হয় যে, হযরত উমর (রা.)ও অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে গোপনে হিজরত করেছিলেন। কেননা মক্কার যেমন অবস্থা ছিল সে দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ্যে এমনটি করা সম্ভব ছিল না। বরং আমরা দেখি, মক্কা বিজয় পর্যন্ত যে-ই হিজরত করেছে সে গোপনে হিজরত করাকেই নিরাপদ মনে করেছে। যাহোক, যদি হযরত আলী (রা.)'র বর্ণনাকে সঠিক বলেও ধরে নেওয়া হয়, তাহলে হতে পারে এটি ব্যক্তিগত কাজ ছিল। কিন্তু বাহ্যিক সাক্ষ্য প্রমাণে এটিই মনে হয় যে, তা সঠিক নয়।

(আল ফারুক উমর, প্রণেতা মহম্মদ হোসেন হেকাল, ১ম ভাগ, পৃ: ৫৩-৫৪, প্রকাশনা- দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত, ২০০৭)

হযরত বারা বিন আযেব (রা.) বর্ণনা করেন, মুহাজিরদের মাঝে সর্বপ্রথম যিনি আমাদের কাছে আসেন তিনি ছিলেন হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.), যিনি বনু আব্দুদ্ দার গোত্রের সদস্য ছিলেন। এরপর হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম আসেন, যিনি অন্ধ ছিলেন এবং বনু ফেহের গোত্রের সদস্য ছিলেন। এরপর হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) কুড়িজন লোকের সাথে বাহনে চড়ে আসেন। আমরা মহানবী (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি (সা.) আমাদের পিছনেই রয়েছেন অর্থাৎ, কিছুদিনের মধ্যেই চলে আসবেন। এর কিছুদিন পর মহানবী (সা.) আগমন করেন আর তাঁর সাথে ছিলেন আবু বকর (রা.)।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৪৫)

যদি এ বর্ণনাটি সঠিক হয়, তাহলে অধিক সম্ভাবনা এটাই যে, হযরত উমর (রা.) কোন এক সময়ে কোন মজলিসে হিজরতের উল্লেখ করেছিলেন হয়তো আর আবেগের আতিশয্যে একথা বলেছিলেন যে, পারলে আমাকে ঠেকিয়ে দেখাও! কিন্তু হিজরত গোপনেই করেছিলেন। কেননা বর্ণনায় এসেছে যে, কুড়িজন তার সাথে ছিলেন। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। হযরত উমর (রা.) মদীনায় পৌঁছে কুবায় রিফা' বিন আব্দুল মুনযের-এর আতিথ্য গ্রহণ করেন। (সিয়ারুর সাহাবা, ১ম খণ্ড,পৃ: ৯৩)

যেমনটি আমরা জানি, কুবা মদীনা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত উঁচু স্থান। আর এখানে আনসারদের কয়েকটি গোত্র বসবাস করত। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিল আমর বিন অওফ-এর গোত্র। সেই গোত্রের নেতা ছিলেন কুলসুম বিন হিদম। কুবা পৌঁছে মহানবী (সা.) তার বাড়িতেই অবস্থান করেছিলেন।

(ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ২৩০)

হযরত উমর (রা.)'র ভ্রাতৃত্ববন্ধন সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনা অনুসারে মহানবী(সা.) হযরত উমর (রা.) ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। কিন্তু এ ভ্রাতৃত্ববন্ধনও দু'বার স্থাপিত হয়েছিল। একবার মক্কায় আর আরেকবার হিজরতের পরে মদীনায়। মক্কায় যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন সে সময় মহানবী (সা.) নিজের সাথে হযরত আলী (রা.)-কে রেখেছিলেন আর হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে হযরত উমর (রা.)'র ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। যাহোক, ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপনের এ দু'টি পৃথক ঘটনা। মদীনায় মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন রচনা করেছিলেন।

একটি বর্ণনা অনুসারে মহানবী (সা.) হিজরতের পর হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) এবং হযরত উওয়ায়েম বিন সায়েদা (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। আরেকটি বর্ণনা অনুসারে মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)'র ভ্রাতৃত্ব বন্ধন হযরত ইতবান বিন মালেক (রা.)'র সাথে স্থাপন করেছিলেন। আরেকটি বর্ণনা অনুসারে হযরত উমর (রা.)'র ভ্রাতৃত্ব বন্ধন হযরত মুআয বিন আফরা (রা.)'র সাথে স্থাপন করেছিলেন।

(সুবালুল হুদা ওয়ার রুশাদ ফি সীরাতিল খাইরিল ইবাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৩) (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২০৬)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, হযরত উমর (রা.)'র ভ্রাতৃত্ব বন্ধন হযরত ইতবান বিন মালেক (রা.)'র সাথে স্থাপিত হয়েছিল।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২৭৭)

আযানের সূচনা কীভাবে হয়েছিল- এ সম্পর্কে একটি বর্ণনা এভাবে পাওয়া যায় যে, মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, আমরা প্রভাতে মহানবী (সা.)-এর সমীপে আসি এবং আমি তাঁকে (সা.) আমার স্বপ্ন শোনাই। এ বিষয়টি হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)'র স্মৃতিচারণের সময় উল্লেখ করা হয়েছিল। এখন যেহেতু হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ করা হচ্ছে, তাই উক্ত ঘটনা সংক্ষিপ্তাকারে কিছুটা উল্লেখ করছি অথবা অন্য রেওয়ায়েতের আলোকে বলে দিচ্ছি। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি যে স্বপ্নের বর্ণনা দিয়েছ, নিঃসন্দেহে তা সত্য স্বপ্ন। তুমি বেলালের সাথে যাও, কেননা তোমার তুলনায় বেলালের স্বর উঁচু এবং সে (বিভিন্ন) ঘোষণাও দিয়ে থাকে। (স্বপ্নে) তোমাকে যা বলা হয়েছে, তুমি তাকে বলতে থাক, বেলাল তা ঘোষণা করতে থাকবে। তিনি অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ বলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) যখন নামাযের জন্য হযরত বেলাল (রা.)'র আহ্বান শুনেন, তখন তিনি (রা.) নিজের চাদর গুটাতে গুটাতে মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসে উপস্থিত হন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, নিশ্চয় আমিও (স্বপ্নে) ঠিক সেরূপই দেখেছি যেরূপ সে আযানে বলেছে। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) বলেন, সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্র, (এখন) বিষয়টি আরো সুদৃঢ় হল। (সুনানে তিরমিযি, কিতাবুস সলাত, হাদীস-১৮৯)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মহানবী (সা.)-এর যুগে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ নামের এক সাহাবী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্বপ্নের মাধ্যমে আযান শিখিয়েছিলেন। আর মহানবী (সা.) তার সেই স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে মুসলমানদের মাঝে আযানের রীতি প্রচলন করেন। পরবতীতে কুরআনের ওহীও উক্ত বিষয়টির সত্যায়ন করে। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমাকেও আল্লাহ্ তা'লা এই আযানই শিখিয়েছিলেন। কিন্তু কুড়ি দিন যাবৎ আমি নীরব থাকি - এই ভাবনায় যে, অন্য এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে বিষয়টি বর্ণনা করেন। যেহেতু পূর্বেই বর্ণিত হয়েছিল, তাই আমি নীরব ছিলাম তথা, বর্ণনার আর প্রয়োজন পড়ে নি। এর প্রতিই মহানবী (সা.)-এর হাদীস ইশারা করে " ***আল মু'মিনু ইয়ারা আও ইউরা লাহু*** "অর্থাৎ মু'মিনকে কখনো সরাসরি সুসংবাদ প্রদান করা হয় আর কখনো কখনো অন্যের মাধ্যমে তাকে সংবাদ পৌঁছানো হয়।"

(তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৬২৪-৬২৫)

বাকি ইনশাল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করব।

এখন সংক্ষিপ্তভাবে এদিকেও আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, আজ রমযানের শেষ জুমু'আ। এটিকে কেবল রমযানের শেষ জুমুআ হিসেবে পরিগণ্য করবেন না, বরং এ জুমুআ আমাদের জন্য ভবিষ্যতের নতুন পথ উন্মোচনকারী হওয়া উচিত। রমযানে যেসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে আর যেসব পুণ্যকর্ম করার সৌভাগ্য হয়েছে- তা রমযানের পরও আমাদের অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা উচিত, বরং এক্ষেত্রে আরো উন্নতি সাধন করা উচিত। অন্যথায় রমযান মাস অতিবাহিত করা আমাদের জন্য মূল্যহীন- যদি আমরা এই পুণ্যকর্ম এবং পবিত্র পরিবর্তনসমূহ ধরে না রাখি এবং এক্ষেত্রে উন্নতি সাধন না করি। বিগত জুমুআয় আমি দরূদ ও ইস্তেগফারের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম। তা কেবল রমযান পর্যন্তই যেন সীমাবদ্ধ না থাকে, অর্থাৎ রমযান অতিক্রান্ত হল আর আমরা জাগতিক কাজেকর্মে এমনভাবে নিমগ্ন হয়ে গেলাম যে, দোয়া এবং ইস্তেগফারের কথাই ভুলে গেলাম (এমন যেন না হয়)। এদিকে ইশারা করেই আমি বিশেষভাবে বলেছিলাম, আমাদের এ বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে। বর্তমান যুগে, যখন দাজ্জালি ষড়যন্ত্র নতুন নতুন অস্ত্র ব্যবহার করছে, জাগতিক চাকচিক্য অধিকাংশ মানুষকে নিজের বেড়াজালে আবদ্ধ করছে, আমাদের যুবকরা আর অনেক সময় শিশুরাও সেই চাকচিক্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় আমাদের নিজেদের জন্যও অনেক দোয়া করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই শয়তানি ও দাজ্জালি আক্রমণ থেকে রক্ষা করুন।

আর নিজ সন্তানদেরকে নিজেদের সাথে সম্পৃক্ত রেখে, নিজেদের সাথে আবদ্ধ করে, নিজের সাথে তাদের একটি বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব এবং ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করাও আবশ্যক আর পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়ে, সন্তানদের হৃদয়ে পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি করে- তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে দিন, যেন তাদের কোন কাজ, আচার-আচরণ, কর্ম এবং চিন্তাভাবনা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি পরিপন্থী না হয়, তাঁর শিক্ষার পরিপন্থী না হয়। তাদের নিকট যেন পার্থিব জগতের সকল মতাদর্শ এবং ফিতনার উত্তর থাকে। এমনটি যেন না হয় যে, কিছু প্রশ্নের উত্তর তাদের জানা না থাকার দরুন তারা অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়বে। এসব ফিতনার সঠিক প্রত্যুত্তর জেনে তারা যেন নিজেদেরকে সেসব ফিতনা থেকে নিরাপদ রাখতে পারে। এটিই আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জীবনকে সুন্দর ও নিরাপদ করার নিশ্চয়তা প্রদান করবে। আর সকল প্রকার নৈরাজ্য থেকে নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মকে রক্ষা করার জন্য এটিই সঠিক পদ্ধতি। কিন্তু যতক্ষণ আমরা নিজেরা ঈমান ও বিশ্বাসের উচ্চ মানে উপনীত হতে না পারব, ততদিন এমনটি করা সম্ভব হবে না। ততক্ষণ পর্যন্ত এটি সম্ভব হবে না যতক্ষণ আমরা সেই মানে না পৌঁছব যেটি এক মু'মি নের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। এটি তখনই সম্ভব হবে যখন আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে। আমাদের নামায এবং আমাদের ইবাদত উন্নত মানের হবে। (এটি তখনই সম্ভব হবে) যখন আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার প্রকৃত দায়িত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। আমাদের স্কন্ধে এটি অনেক বড় একটি দায়িত্ব অর্পিত হয়, আমরা যেন নিজেদের ঈমানকে সুদৃঢ় করে, নিজেদের ব্যবহারিক কর্মের প্রতি দৃষ্টি রেখে, নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার মাধ্যম হই। বর্তমানে নির্লজ্জতা ও বৃথা কাজকর্মের যতটা ছড়াছড়ি, সম্ভবত এর পূর্বে এতটা কখনোই ছিল না। টিভি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রত্যেক বাড়িতে এখন সবকিছু হাতের মুঠোয়। পূর্বে বাড়ির বাইরে গেলে বিপদের আশঙ্কা থাকতো, আর এখন তো বাড়ির ভেতরেও বিপদ। শিশুরা লুকিয়ে বসে দেখতে থাকে, কেউ জানতেও পারে না যে, তারা কী দেখছে। কাজেই অনেক বেশি সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে।

যারা বুযুর্গদের বা প্রাথমিক যুগের আহমদীদের সন্তান, বা এমন আহমদীদের সন্তান যারা নিজেরা বয়আত করে আহমদী জামাতভুক্ত হয়েছেন, যুগ ইমামকে মেনেছেন এবং নিজেদের ঈমানের সুরক্ষার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য সদা প্রস্তুত ছিলেন এবং তা করেছেন, কুরবানী দিয়েছেন, তাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, আমরাও যদি ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিয়ে আমাদের নিজেদের অবস্থার প্রতি পর্যবেক্ষণমূলক দৃষ্টি রাখতে সক্ষম হই, তবেই আমারা নিজেদেরকে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে পারব। কোন বংশ তা সে যে বংশই হোক না শুধুমাত্র একজন বুযুর্গ ব্যক্তির পরিবারের সদস্য হওয়া বা বুযুর্গ ব্যক্তির সন্তান হওয়া কোন আহমদীর জন্য এই নিশ্চয়তা দিতে পারে না যে, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি অনুগ্রহরাজি বর্ষণ করতে থাকবেন বা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যবহারিক আচার আচরণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। আমাদের কর্মকাণ্ডই আমাদের পরিত্রাণের কারণ হবে। কারও আত্মীয়তার সম্পর্ক বা কারও বংশ পরিচয় কাউকে রক্ষা করতে পারবে না। তাই এর জন্য সর্বদা অনেক দোয়া করাও প্রয়োজন। ধর্মীয় বিষয়াদির ক্ষেত্রে নিজেদের দুর্বলতার প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া উচিত। নিজেদের সন্তান-সন্ততির জাগতিক উন্নতির চাইতে ধর্মের ক্ষেত্রে বেশি উন্নতি সাধনের জন্য দোয়া করা উচিত। জাগতিক উন্নতি সাধনের জন্য আমরা অনেক দোয়া করে থাকি, ধর্মীয় বিষয়াদিতে উন্নতি সাধনের জন্য এর চাইতেও বেশি দোয়া করা

ঘটেছে- শিশুকে ঘরে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে, সন্ধ্যায় যখন দরজা খোলা হয়েছে, শিশু মৃতাবস্থায় পাওয়া গেছে। তাই এটাও এক প্রকার নির্যাতন, কোনওক্রমেই এর অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। তাই যতটা সহ্য করতে পার ততটা রাখ, দুই-একটি রোযা রাখতে পার। যেদিন আবহাওয়া ঠান্ডা, সেদিন রেখো। এখন কোনও প্রকারের রোযা তোমাদের জন্য আবশ্যক হয় নি।

এক ওয়াকফে নও দোয়ার আবেদন জানিয়ে বলে, আমার কানের চারটি অপারেশন হয়েছে। বাম কানে শুনতে পাই আর ডান কানটি এখনও ঠিক হয় নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ কৃপা করুন।

প্রশ্ন: কুরআন করীমের সূরা রহমানে জিন এবং ইনস-এ উল্লেখ রয়েছে। ইনস-এর অর্থ মানুষ আর জিন বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: জিন বলতে অনেক কিছু হতে পারে। যে কোন অপ্রকাশিত সত্তাকে জিন্ন বলে। এই কারণে হাদীসে ব্যাকটেরিয়ার জন্যও জিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসে উল্লেখ আছে যে জঙ্গলে তোমরা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার পর নিজেকে পরিস্কার করার জন্য যদি কোন হাড়ের টুকড়ো পাও, তবে সেটি ব্যবহার করো না। কেননা তাতে জীবাণু থাকে। অদৃশ্য বস্তু থাকে। তাই এর পরিবর্তে পাথর ব্যবহার করো।

হুযুর আনোয়ার বলেন, পাহাড়ের মধ্যে অন্তরালে জীবনযাপনকারী লোকদেরও জিন্ন বলা হয়। যে সব প্রভাবশালী ব্যক্তি সচরাচর জনসমক্ষে আসে না, তারাও জিন্ন। এই কারণে কিছু মানুষকে এজন্যও জিন বলা হয়ে থাকে কারণ তারা নিজেদেরকে সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার কিছুটা উর্দ্ধে বলে মনে করে। তাই এভাবে বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। সারসংক্ষেপ এই যে, প্রত্যেক গোপন বস্তু বা নিজেকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্নকারী মানুষদের জন্য জিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন: যেদিন আপনি খলীফা হলেন, সেদিন আপনার অনুভূতি কেমন ছিল? এটি তো অনেক বড় দায়িত্ব।

সেদিনের ভিডিও দেখে নিও। এম.টি.এ-র দল অনেক স্থানের ছবি তুলে রেখেছে, তাদেকে দেখাতে বলো, দেখলে নিজেই বুঝতে পারবে। কেমন লাগছিল তা আমার মুখটিতে দেখতে পাবে।

প্রশ্ন: খিলাফতের পূর্বে আপনি রাইডিং (অশ্বারোহন)করতেন। এখন কি রাইডিং করার সময় পাওয়া যায়?

আগেও আমি নিয়মিত রাইডিং করতাম না। তবে শিক্ষাজীবনে রাইডিং করতাম, এখন সময় পাই না। কিন্তু কখনও কখনও, দুই-চার মাসের পর ইসলামাবাদে গেলে রাইডিং করা দেখি। সেখানে জামাত ঘোড়া রেখেছে, জামেয়ার ছাত্ররা সেখানে অশ্বারোহণ করতে আসে। আতফালরা অশ্বারোহন করলে সুযোগ পেলে কখন কখনও সেখানে গিয়ে দেখি।

প্রশ্ন: 'ওয়াকফে নও'-এর অর্থ কি?

হুযুর বলেন, ওয়াকফে নও-এর অর্থ নতুন ওয়াকফ। অর্থাৎ- শিশুদেরকে ওয়াকফ করার যে নতুন স্কীম বের হয়েছে, যার অধীনে পিতামাতা তাদের সন্তানকে জন্মের পূর্বেই ওয়াকফ করে দেয় আর সন্তান বড় হয়ে, পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার পর পুনরায় এই মর্মে বন্ড লেখে যে 'আমি আত্মোৎসর্গ করতে চাই'। আরেকটি হল ওয়াকফে আওলাদ'। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, দুই চার বছর যখন তার বয়স হয়, সে সময় পিতামাতা তাকে ওয়াকফ করার বাসনা করে। তখন সেই সন্তান ওয়াকফে আওলাদ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই স্কীমটি আগে থেকেই চলছে।

প্রশ্ন: আমাদের একটি ইসলামী প্রদর্শনী হয়েছিল। এক খৃষ্টান বন্ধু আমাদেরকে প্রশ্ন করেছিল যে সূরা মায়েদায় খোদা তা'লা হযরত ঈসা (আ.)কে প্রশ্ন করেছেন যে, আপনি আপনার জাতিকে কি আপনার এবং আপনার মায়ের ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন? সেই ব্যক্তি বলেন, আমরা তো হযরত ঈসা (আ.)-এর মায়ের ইবাদত মোটেই করি না। অথচ কুরআন শরীফে লেখা আছে যে ইবাদত করে।' এভাবে সে প্রমাণ করতে চেয়েছে যে কুরআন করীম ভুল বর্ণনা দিয়েছে। নাউযু বিল্লাহ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইবাদত করে না, কে বলেছে? হযরত ঈসা (আ.) এর সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস যে তিনি আকাশে বসে আছেন। এছাড়া তারা বলে, খোদা তিন সত্তার সমষ্টি। তার তিন খোদায় বিশ্বাসী, পিতা-পুত্র-রুহুল কুদুস। খোদা যেহেতু তিনজন, আর ইবাদত খোদার করা হয়, যখন চাওয়া হয় তখন ঈসা (আ.)-এর নামে চাওয়া হয়। খোদার সামনে হাত না পেতে এভাবে ক্রুশ লাগিয়ে রাখে। এগুলিই তো ইবাদত, ইবাদত আর কি? তারা যা কিছু প্রার্থনা করে, দাবি করে যে এটি ঈসা (আ.) আমাদেরকে দিয়েছেন। এখন তাদেরকে বল এগুলি ছেড়ে দাও, নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাও। ভ্যাটিকান কর্তৃপক্ষও ঘোষণা করেছে, যে ঈসার আসার কথা ছিল, তিনি আর আসবেন না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: খৃষ্টানদেরও অনেক ফির্কা রয়েছে, যাদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদ রয়েছে। আর বাইবেলের এমন বহু আয়াত আছে যেগুলির বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আপত্তি করেছেন আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমণের পর সেগুলিকে বাইবেল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। তাই এগুলি এমন সব কাজ যা থেকে সংশয় জন্ম নেয়। তারা সংশয়ে নিপতিত। যেমনটি আমি বলছি, ভ্যাটিকান কর্তৃপক্ষ বলেছে, হযরত ঈসা (আ.) যে বলেছিলেন, 'আমি পৃথিবীতে পুনরায় আসব' , কিন্তু তিনি পৃথিবীতে আসবেন না। সেই সময় তিনি হয়তো সুরার নেশায় আচ্ছন্ন ছিলেন, তাই নেশার ঘোরে পুনরায় আসার কথা বলেছিলেন।' একথা লেখা আছে আর ইন্টারনেটেও আজকাল পাওয়া যায়। তোমরা পড়ে নিও। জার্মান এবং ইংরেজিতেও সর্বত্রই ভ্যাটিক্যানের পাদ্রীদের এই বিবৃতি পাওয়া যায়। এখন তারা বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে অন্য কোন কাজ দিয়েছেন, যা করার জন্য তিনি অন্য কিছু করছেন। পৃথিবীর সংশোধন হল না, অথচ অন্য কোন জগতের সংশোধনের জন্য তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তারা এই সব অসংলগ্ন কথা বার্তা বলে থাকে। কুরআন করীম যা কিছু বলে সত্য বলে। আর এরা যা কিছু বলে তা নিরন্তর পরিবর্তিত হতে থাকে। যেমনটি আমি বলেছি, বাইবেলের বহু আয়াত আছে, যেগুলি নিয়ে আপত্তি করলে তারা নতুন প্রিন্ট বার করে, যেখানে সেই আয়াতগুলিকে পাল্টে ফেলা হয়। আর বাইবেলও একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিভিন্ন প্রকারের সংস্করণ আছে। তাই তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উপাস্য তৈরী করেছে আর তাঁর সঙ্গে অংশীদার করেছে।

প্রশ্ন: হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে জান্নাত মায়েদের চরণতলে অবস্থান করে। জান্নাত প্রত্যেক মায়ের চরণতলে থাকে নাকি কেবল মুসলমান মায়েদের চরণতলে থাকে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: 'জান্নাত মায়েদের পায়ের নীচে থাকার অর্থ হল মা যদি উত্তম শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে থাকে আর সন্তান পুণ্যবান হয়, সৎকর্মশীল হয়, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করে, তবে সন্তান পুণ্যকর্মের কারণে জান্নাতে যাবে। যে কোন মা হোক, সে যদি সন্তানকে এমনভাবে শিক্ষিত করে তোলে যার ফলে সে খোদাকে চিনতে পারে, আর খোদা তা'লার নির্দেশাবলী মেনে চলার পথ অনুসন্ধান করে, তবে সেই মা সন্তানকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার কারণ হয়। হযরত মূসা (আ.)ও তাঁর পরের নবীর সুসংবাদ দান করেছিলেন। হযরত ঈসা (আ.)ও এমন সংবাদ দিয়েছিলেন। পূর্বের নবীরা আঁ হযরত (সা.)-এর আগমণ বার্তা দিয়ে গিয়েছিলেন। তারা যদি তাঁকে মান্য না করে, তবে মোমেন হতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন, খৃষ্টান, ইহুদী এবং মাজুসীদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ তারা মোমেন হলে তাদেরকে জান্নাতে দেওয়া হবে। এর অর্থ এই যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)বলেছেন, তারা নিজেদের পুণ্যের কারণে আঁ হযরত (সা.)এর বয়আতের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাঁকে মান্য করবে আর আল্লাহ্

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক মহৎ, যে আপন ভাইয়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং হতভাগ্য সে, যে হঠকারিতা করিয়া ক্ষমা করে না।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদিগকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগেক দান করা হইয়াছে তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। **(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

তা'লাও তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। তাছাড়া জান্নাত ও দোযখের সিদ্ধান্ত করা আল্লাহ্‌র কাজ, মানুষের কাজ নয়। এর অর্থ এই যে একজন মোমেন ও মুসলমান মহিলা যদি নিজের সন্তানের সঠিক লালন পালন করে, তাকে আল্লাহ্ ও রসুলের নির্দেশ মান্যকারী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে এবং আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী বানাতে পারে। আর সেই সন্তান যদি সৎকর্মশীল হয় তবে সে জান্নাতে যাবে। তাই এমনটি বলা যাবে না যে অন্যান্য মায়েরা যারা মুসলমান নয় তারা নিজেদের সন্তানের সঠিক লালন পালন ও শিক্ষা দীক্ষা দিলেও জান্নাতে যাবে না। কেননা বহু উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী রয়েছে, আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমাশীল। যে কোন ব্যক্তিকে যে কোনও পুণ্যের ভিত্তিতে জান্নাতে পাঠাতে পারেন। দুইজন ব্যক্তির মধ্যে বির্তক আরম্ভ হয়। এক ব্যক্তি বলল, তুমি এই এই অসৎ কাজ কর, তাই তুমি জান্নাতে যেতে পারবে না। আর আমাকে দেখ, কত সব পুণ্য কর্ম করি, ইবাদত করি। আমার মর্যাদা উচ্চ। যাইহোক মৃত্যুর পর উভয়ে আল্লাহ্ দরবারে উপস্থিত হল। আল্লাহ্ তা'লা বললেন, জান্নাত বা দোযখের বিচার করার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে? একমাত্র আমিই জান্নাতে কিম্বা দোযখের বিচার করি। যাকে তুমি বলেছ সে জান্নাতে যাবে না, দোযখে যাবে, তাকে আমি জান্নাতে পাঠাচ্ছি আর আর তুমি মহান ইবাদতকারী আর সৎকর্মশীল হওয়া নিয়ে তোমার মধ্যে যে অহংকার জন্ম নিয়েছিল, সেই কারণে তোমাকে দোযখে পাঠাচ্ছি। এর বিচার আল্লাহ্ তা'লা করবেন। আর এর অর্থ হল মা যদি ভাল করে সন্তানদের লালন পালন করে, শিক্ষাদীক্ষা দেয়- আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, এমন মুসলমান মোমেন মায়ের সন্তান ইনশাআল্লাহ্ জান্নাতে যাবে, সেই সব পুণ্যকর্মের সুবাদে যা তারা উন্নত শিক্ষাদীক্ষার কারণে করবে।

প্রশ্ন: জামাতের ক্যালেন্ডারগুলিতে আয়াত লেখা থাকে কিম্বা খলীফাদের ছবি থাকে। বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর সেগুলি কি করা উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি সেগুলি সংগ্রহ করে রাখতে না পার, তবে সেগুলি পুড়িয়ে দাও বা শ্রেড করে দাও। এখানে শ্রেড পাওয়া যায়। প্রতিটি বাড়িতে শ্রেড থাকে না, তাই পুড়িয়ে দিও।

প্রশ্ন জামাতে আহমদীয়ার নাম কে রেখেছে এবং কিভাবে রেখেছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, এই নাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রেখেছেন। ১৯০১ সালে যখন আদমশুমারি হয়। এখানে জার্মানীতে আদমশুমারিকে Volkszahlung বলা হয়। কোন দেশের জনসংখ্যা কত, তাতে পুরুষ ও মহিলাদের লিঙ্গ অনুপাত, শিশুদের সংখ্যা, কোন কোন ধর্মের মানুষ বাস করে ইত্যাদি তথ্য জানার জন্য সেদেশের সরকার আদমশুমারি করে থাকে। আর প্রতি দশ বছর অন্তর হয়ে থাকে। ১৯০১ সালে ভারতে যে আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজ জামাতের সদস্যদের বলেন, 'আমাদেরকে অন্যান্য মুসলমানদের থেকে স্বতন্ত্রতা অর্জনের জন্য এবং নিজেদেরকে আহমদী তথা আহমদী মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেওয়ার জন্য, যারা প্রতিশ্রুত মসীহকে মান্য করেছে, তোমরা নিজেদের নামের সঙ্গে আহমদী মুসলমান লিখো। এই আদমশুমারির যখন ফর্ম আসবে, তখন তাতে তোমরা আহমদী মুসলমান লিখো, যাতে বোঝা যায় যে আমরা আহমদী আর দেশের সরকারও জানতে পারে যে আমাদের সংখ্যা কত? এই কারণে আহমদী নাম রাখা হয়েছে আর সেটি রাখা হয়েছিল সেই যুগেই।

প্রশ্ন: প্রাচীন যুগে নবী কিভাবে জানতে পারতেন যে তিনি একজন নবী?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আধুনিক যুগে কিভাবে জানতে পারে?

কোন টেলিভিশনে ঘোষণা হয় কি? এমনটি তো কখনই হয় না। প্রশ্ন হল, যে যুগে আঁ হযরত (সা.)-এর অনুসরণে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাব ঘটল, যাঁকে আঁ হযরত (সা.)নবী নামে অভিহিত করেছেন। আর তিনি নবী ছিলেন, কিন্তু সে যুগে কোন টেলিভিশন বা রেডিও বা অন্য কোথাও কোনও ঘোষণা দেওয়া হয় নি। সংবাদপত্রের প্রচলন সেযুগে শুরু হয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে নবী বলেছেন,আর ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীর মানুষ তা জানতে শুরু করে। আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে সংবাদ মাধ্যম ছিল না। এই কারণেই তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন সম্রাটের উদ্দেশ্যে এই মর্মে তবলীগি চিঠি লেখেন যে 'তোমাদের বিভিন্ন ধর্মের নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যে শেষ শরিয়ত ধারী নবী আসার কথা ছিল, তিনি এসে গিয়েছেন আর আমিই সেই ব্যক্তি। তাই বিভিন্ন বাদশাহকে লেখা চিঠির মাধ্যমে তাদেরকে তাঁর বার্তা পৌঁছেছিল। এছাড়া যারা মুসলমান ছিল, সাহাবা ছিল, তারা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে তবলীগ করতে গিয়ে বললেন যে নবী এসে গিয়েছে। অনেকে দাবি করে যে যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামের প্রসার হয়েছে। যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামের প্রসার হয় নি। চীনের সঙ্গে আরবদের কোন যুদ্ধ হয় নি। কিন্তু চীনেও কোটি কোটি মুসলমান আছে। সেই যুগে সাহাবারা সেখানে গিয়েছিলেন, যারা সেখানে তবলীগ করেছেন আর এর ফলে চীনের বাসিন্দারা মুসলমান হয়ে গিয়েছে। অনুরূপভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মুসলমান হয়েছে। তাই এভাবে তবলীগ করে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, যে- নবীর আসার কথা ছিল, তিনি এসে গিয়েছেন আর আঁ হযরত (সা.) সমগ্র জগতের জন্য নবী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা একথাই বলেছেন যে তুমি ঘোষণা করে দাও যে, আমি সমগ্র জগত তথা সমগ্র মানবতার জন্য নবী। সেই কারণেই তিনি সমগ্র জগতকে বার্তা দিয়েছেন আর পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর বাণী পৌঁছেছে। পূর্বে যে সকল নবী আসতেন তারা নিজের নিজের এলাকার জন্য নির্দিষ্ট ছিলেন। সীমিত এলাকার মধ্যে তাদের কাজ নির্ধারিত ছিল। যেমন- কোন জাতির এক বা দুই লক্ষ বা কোন একটি বিশেষ অঞ্চল- সেই এলাকার জন্য তারা নবী হতেন। একই সময়ে দুইজন নবীও হতেন। হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর যুগে হযরত ইব্রাহিমও নবী ছিলেন, এর পাশাপাশি অন্য একটি এলাকা যেখানে হযরত লুত তাঁর জাতির জন্য (খোদার) বাণী নিয়ে এসেছিলেন। হযরত লুত (আ.)ও নবী ছিলেন। তাঁরা ছোট ছোট এলাকার জন্য নবী হতেন, নিজেদের এলাকার মানুষদের বলতেন যে তারা নবী, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ঐশী বাণী সহকারে প্রেরণ করেছেন।

প্রশ্ন: আগে জার্মানীতে জামেয়া ছিল না, লন্ডনে ছিল। এখন জার্মানীতেও তৈরী হয়েছে। যদি কেউ লন্ডনের জামেয়াতে যেতে চায়, সে কি যেতে পারবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, খুব ভালকথা, তুমি আসতে চাইলে আমি তোমাকে ডেকে নিব। যদি তুমি এখানে জার্মানী থেকে লন্ডন এসে জামেয়ায় পড়তে চাও তবে তোমাকে অনুমতি দেওয়া হল, তবে যদি তাদের কাছে সিট থাকে।

প্রশ্ন: শিরকের অর্থ কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: শিরক-এর অর্থ হল কাউকে অংশীবাদী করা। আল্লাহ্ তা'লার সমকক্ষ হিসেবে কাউকে দাঁড় করানো। যেমন, এখন তুমি যদি বল, 'আমি সেখানে যাব আর অমুক ব্যক্তি আমার চাহিদা পুরণ করতে পারে, যে আমাকে টাকা দিতে পারে।' আর তুমি যদি আল্লাহকে ভুলে যাও, তবে এর অর্থ হল তুমি শিরক করেছ। সব সময় একথা বলো যে, অমুক জায়গা যাব, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আমি তার কাছ থেকে টাকা পেয়ে যাব। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, কোন কাজ করার পূর্বে ইনশাআল্লাহ্ বলো। যখন ইনশাআল্লাহ্ বলবে, তখন এর অর্থ, যদি আল্লাহ্ তা'লা চান এই কাজটি তিনি করে দিবেন, কাজটি হয়ে যাবে। তাই এভাবে শৈশব থেকেই তোমাদের মনে শিরকের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণাভাব তৈরী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ছোট ছোট বিষয়েও তোমাদেরকে আল্লাহকে স্মরণ রাখতে হবে। ইনশাআল্লাহ্ বলার পর কাজ আরম্ভ কর। বল, ইনশাআল্লাহ্ আমি কাজটি করে নিব। আল্লাহ্ চাইলে আমি কাজটি

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যতক্ষণ না প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ খোদার নৈকট্যভাজন হওয়ার মর্যদা লাভ হতে পারে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড , পৃ: ৬৪)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Harhari (Murshidabad)**

যুগ খলীফার বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে বিষয়ে আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, সেই অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন।

(ডেনমার্কের জলসা সালানা (২০১৯) উপলক্ষ্যে বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী : **Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)**

করে নিব। এই কাজটি করার শক্তি অন্য কারোর মধ্যে নেই। এছাড়া অনেকে যারা মূর্তি পূজা করে, মূতি সামনে রেখে তাদের কাছে যাচনা করে। এটিও শিরক। যেহেতু কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই যাচনা করা উচিত, তাই আল্লাহ্‌র সমকক্ষ কাউকে দাঁড় করানো বা কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করা শিরক।

প্রশ্ন: যারা রমযান মাসে এতেকাফে বসে, তাদের উদ্দেশ্য কি? অন্যরাও তো রমযানের মধ্যে কুরআন পড়ে এবং একবার সম্পূর্ণ করে নেয়।

হুযুর বলেন, এতেকাফে বসা আবশ্যক তো নয়। বসা বা না বসা তোমার ইচ্ছের উপর নির্ভর করছে। কারণ এটি আঁ হযরত (সা.)-এর সুন্নত ছিল। তিনি রমযান মাসের শেষ দশ দিনে মসজিদ নববীতে এতেকাফে বসতেন। যে ব্যক্তি এতেকাফে বসে, সে পৃথিবী থেকে দশ দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, সংসারের কাজকর্মের কোন চিন্তা তার থাকে না। এতেকাফে বসা হয় এই জন্য যাতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা যায়। অন্যান্য লোকেরা যারা রোযা রাখে, তারা রোযার পাশাপাশি সংসারের বিভিন্ন কাজও করে থাকে, রোযা রেখে অফিসেও যায়। বিকেল চারটে পর্যন্ত তারা অফিসে থাকে, সময় পেলে অফিস থেকে এসে বিকেলে দুই-এক রুকু বা এক পারা তিলাওয়াত করে, কাজের কারণে নামাযগুলিও সংক্ষিপ্ত আকারে পড়ে। যে ব্যক্তি এতেকাফে বসে, সে নফলের সময় নফলও পড়তে পারে, যোহরের পূর্ব পর্যন্ত আর যোহরের পর। এরপর মগরিব ও এশার পরও নফল পড়তে পারে। এছাড়া কুরআন করীম পড়তে পারে, হাদীস পড়তে পারে, ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারে, দোয়া করতে পারে। পুরো চব্বিশ ঘন্টা তার হাতে থাকে। এই দশদিনে রোযা রাখার পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের প্রতিই তার মনোযোগ থাকে। আর যে কাজ সে করছে তা অতিরিক্ত হিসেবে, যারা এটি করার সামর্থ রাখে তারা এতেকাফে বসতে পারে। তবে মসজিদে বসার মত জায়গাও থাকা চায়। কাজেই এটি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নত আর এই সুন্নতের অনুসরণের লোকে এতেকাফে বসে।

প্রশ্ন: জিহাদ বলতে কি বোঝায়? হুযুর আনোয়ারের জিজ্ঞাসার উত্তরে ছেলেটি উত্তর দেয়, 'আমি কেবল এতটুকুই জানি যে এটি খারাপ জিনিস।

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রথম কথাটি বলে দিই- জিহাদ বা যুদ্ধ যখনই মুসলমানেরা করেছে, কখনওই তারা প্রথমে তা শুরু করে নি। প্রত্যেক বার তাদের উপর আক্রমণ হয়েছে বা তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তোলা হয়েছে, আর তার জবাবে মুসলমানেরা যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। একটি জিহাদ বা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'এখন আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে যাচ্ছি। আর বড় জিহাদ হল নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। অর্থাৎ তোমাদের অন্তরে যে সব অপবিত্রতা আছে, সেগুলি দূর কর, এটিও একটি জিহাদ। ইসলামের তবলীগ কর, এটিও জিহাদ। কুরআন করীমের মাধ্যমে জিহাদ করাও জিহাদ। আল্লাহ্ তা'লাও বলেছেন, কুরআন করীমের মাধ্যমে ইসলামের বাণী প্রচার করাও জিহাদ। জিহাদ হল চেষ্টা ও সাধনার নাম। যে কোন কাজের জন্য তোমরা যখন চেষ্টা কর, বস্তুত সেটি তোমাদের জিহাদ। যদি তুমি তবলীগ কর আর এখানে জার্মান নাগরিকদের মাঝে লিফলেটস বিতরণ কর, তবে এটিও জিহাদ।

তোমরা যদি পূর্ণ অভিনিবেশ সহকারে কুরআন করীমের জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা কর, জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এটিও একটি জিহাদ। কেবল অস্ত্র চালনা করাই জিহাদ নয়। মুসলমানেরা এর ভুল অর্থ বুঝেছে কিম্বা মুসলমানদের দিকে আরোপ করা হয়েছে। আর এমনিতেও আজকাল মুসলমানের কাজকর্ম এর চায়তে আলাদা কিছু নয়। এজন্য আমি এ বিষয়টি নিয়ে একাধিক বক্তব্য রেখেছি। তোমরাও এত বড় হয়ে গেছ, ষোলো, সতেরো বছরের হয়ে গেছ, তাই আমার বক্তব্যগুলি পড়ে নিও, জিহাদের অর্থ বুঝতে পারবে। (ক্রমশ.....)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

খুতবার শেষাংশ...

উচিত।

একইভাবে যারা নিজেরা বয়আত করে আহমদী হয়েছেন, তাদেরও নিজেদের চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডকে এই ধারায় পরিচালিত করতে হবে, তবেই আমরা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম স্থায়ীত্ব লাভ করবে। অতএব রমযানের এই অবশিষ্ট দিনগুলোতে এর জন্যও অনেক দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ধর্মকে সুরক্ষিত রাখেন এবং আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। (এ দোয়া করুন) রমযানের পরেও যেন আমাদের ইবাদতের মান ক্রমশ উন্নততর হতে থাকে, আল্লাহ্‌তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়, আমরা যেন দাজ্জালের প্রতারণার ফাঁদ থেকে নিরাপদ থাকি। শুধুমাত্র জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যেন আমাদের লক্ষ্য না হয়, বরং আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকে সেই সব ধর্মীয় ও পার্থিব নিয়ামতে ভূষিত করেন যেগুলো আমাদেরকে আরো বেশি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ করে তুলবে এবং সর্বদা তাঁর সামনে বিনত রাখবে আর আমাদেরকে সর্বদা তাঁর বিশ্বস্ত বান্দা বানিয়ে রাখবে।

একইভাবে এই বিষয়ের প্রতিও আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, বর্তমানে করোনা ভাইরাসের যে মহামারি গোটা বিশ্বকে গ্রাস করেছে, এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং আল্লাহ্ তা'লার দয়া লাভের জন্যও বিশেষভাবে অনেক দোয়া করুন। একইভাবে যেসব দেশে আহমদীয়াতের বিরোধিতা তুঙ্গে রয়েছে এবং যাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলা হয়েছে তাদের জন্যও অনেক বেশি দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য সহজ সাধ্যতা সৃষ্টি করুন। পাকিস্তানের আহমদীদের এই দিনগুলোতে এবং পরবর্তীতেও সর্বদা বিশেষভাবে সদকা-খয়রাত এবং দোয়ার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। আমাদের এসব দোয়া এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের এই প্রচেষ্টা শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

এবং رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ এই দোয়াগুলো অধিক হারে পাঠ করুন, কিন্তু এটিও স্মরণ রাখবেন যে, শুধুমাত্র বুলিসর্বস্ব দোয়া কোন কাজে আসে না। মানুষ চিঠি-পত্রে জিজ্ঞেস করে যে, আমি কোন দোয়া করব। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের নামায সুন্দরভাবে না পড়ব, যতক্ষণ আমরা এর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করব ততক্ষণ শুধুমাত্র দোয়া কোন কাজে আসে না। রমযান মাসে যেভাবে নামাযের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়, তা এর পরেও অব্যাহত থাকা উচিত, কেবল তবেই আমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও সাহায্য প্রকৃতপক্ষে লাভ করতে সক্ষম হব।

অনুরূপভাবে সকল প্রকার ফিতনা বা নৈরাজ্য থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও অনেক বেশি দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সফলতার সাথে রমযান অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন। রমযান মাসের আর মাত্র চার পাঁচ দিন অবশিষ্ট আছে, তা যেন আমরা সফলতার সাথে অতিক্রম করতে পারি। আমরা যেন রমযানের পরও এসব পুণ্যকাজ ধরে রাখতে পারি। এটিও স্মরণ রাখবেন, আমরা আমাদের দোয়ার পরিধি যত প্রশস্ত করব ততই আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ আমাদের ওপর বর্ষিত হবে। তাই বিশেষভাবে প্রত্যেক আহমদীকে সকল আহমদীর সর্বপ্রকার সমস্যা দূরীভূত হওয়ার জন্যও দোয়া করতে থাকা উচিত। এর ফলে মনের অজান্তে পারস্পরিক ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হবে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের অংশ তো লাভ হবেই, পাশাপাশি এই ব্যবহারিক উপকারও হবে, অর্থাৎ অনেক বেশি প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।

সার্বিকভাবে মুসলিম উম্মতের জন্যও দোয়া করুন। যে দিকে তারা অগ্রসর হচ্ছে এবং যারা যুগের ইমামকে অস্বীকার করে নিজেদের ইহ ও পরকালকে নষ্ট করছে, তা থেকে আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে সুরক্ষিত রাখুন। সমগ্র মানবতার জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও সুপথে পরিচালিত করুন এবং আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা লাভের সৌভাগ্য দান করুন। যাহোক, আমাদের কাজ হল দোয়া করা, দোয়া করা এবং দোয়া করতে থাকা, রমযান মাসে এবং রমযান মাসের পরেও। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

****

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 17 June, 2021 Issue No.24

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

যে সমস্ত মানুষ জাগতিকতার সন্ধানে থাকে, তারা যত উন্নতি করে, ততই তাদের মনের দহন বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু যারা খোদার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আর যতই তারা সে দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, ততই তাদের আন্তরিক প্রশান্তি বৃদ্ধি পায়।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা রাআদ এর ২৯ নং আয়াত

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

এর ব্যাখ্যায় বলেন:

মানুষ অর্থ উপার্জন করে, শাসন করে, তারা সুসন্তানের অধিকারী হয়, সুশীলা স্ত্রী পায়, ভাল বন্ধু পায়, ব্যবসায়ে লাভ করে, কৃষিকাজে লাভ করে, জ্ঞানের জগতে উৎকর্ষ লাভ করে- মোট কথা সব কিছুতেই উন্নতি করে, কিন্তু তবুও মন প্রশান্তি লাভ করে না। একটি বাসনা পূর্ণ হলে দুটি আরও দুঃখ ও বাসনা সৃষ্টি হয়ে যায়। আর মনের মধ্যে সব সময় এই অনুভূতি কাজ করে যেন যে প্রকৃত বস্তুর বাসনা সে করেছিল তা এখনও পায় নি। যেভাবে মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি শিশু কখনও এর বুকে, কখনও তার বুকে আশ্রয় খুঁজে ফেরে, কিন্তু কোথাও স্বস্তি পায় না। কেননা যে বস্তুটি সে খোঁজে তা সে পায় না। অর্থাৎ তার প্রকৃত মাকে সে খুঁজে পায় না। অনুরূপ অবস্থা জাগতিক সমৃদ্ধি অর্জনকারীদের হয়ে থাকে।

আঁ হযরত (সা.) একটি যুদ্ধে এক মহিলাকে দেখেন যার শিশু হারিয়ে গিয়েছিল। সে যে শিশুকেই দেখছিল তাকেই বুকে জড়িয়ে ধরছিল, আদর করছিল আর তাকে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে সে তার শিশুকে খুঁজে পায় এবং তাকে নিয়ে শান্তিতে বসে পড়ে। হুযুর (সা.) সাহাবাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, যেভাবে ঐ মহিলাটি শিশুকে খুঁজে পাওয়ায় আনন্দিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার তার থেকে বহুগুণ বেশি আনন্দিত হন, যখন তাঁর কোন পাপাচারী বান্দা তাঁর প্রতি মনোযোগি হয়। নবী করীম (সা.) এই ঘটনার অন্য একটি শিক্ষণীয় দিক বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই ঘটনা বর্ণনা করার পিছনে আমার উদ্দেশ্য হল সেই মহিলা নিজের প্রকৃত গন্তব্য খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত কতটা ব্যকুল ছিল, কিন্তু গন্তব্য পাওয়ার পর সে প্রশান্তি লাভ করল। প্রত্যেক মানুষেরও অনুরূপ অবস্থা হয়ে থাকে। প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করার পর সেই ব্যকুলতা দূর হয় আর মন প্রশান্তি লাভ করে। অতএব, খোদাকে স্মরণ করাই যেহেতু মানুষের সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাই যখন খোদা লাভ হয়, তখন আর কোন জ্বালা ও ব্যকুলতা থাকে না, থাকে কেবল প্রশান্তি। যে সব মানুষ জাগতিকতার সন্ধানে থাকে, তারা যত উন্নতি করে, ততই তাদের মনের দহন বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু যারা খোদার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আর যতই তারা সে দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, ততই তাদের আন্তরিক প্রশান্তি বৃদ্ধি পায়। এর থেকে প্রমাণ হয় যে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর স্বীয় সত্তার অন্বেষণকেই আমাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাই সেই উদ্দেশ্য যখন পূর্ণ হয়, মানুষ তখন প্রশান্তি লাভ করে। আমাদের রাজ্যগুলির অবস্থাই দেখুন। যদিও তাদের নিরাপত্তার বিধান সরকারের মাধ্যমে হয়ে থাকে, কিন্তু কিছু কিছু জমিদার এতটাই ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন যে তাদের জন্য বিদেশ থেকে প্যাকেটজাত পানি আসে, তাদের সামনে তা খোলা হয়, তারপরেও অন্য কাউকে খাইয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর রাজা মশাই সেই পানি পান করেন। ঠিক একইভাবে তাদের খাবার হাজার হাজার সতর্কতা অবলম্বনের পর পরিবেশন করা হয়। এর আগে রাঁধুনিকেই খাওয়ানো হয়, এরপর ডাক্তার সেটিকে খেয়ে দেখার পর তার জন্য পরিবেশন করা হয়। যেন প্রতি মুহূর্তেই বিপদ উপস্থিত তাই এত সতর্কতা! মুহুর্মুহু অস্থিরতা বিরাজ করছে। কিন্তু আমাদের রসূল হযরত মহম্মদ (সা.) কে দেখুন! চতুর্দিকে শুধুই শত্রু, তবু কোন বিপদ নেই, প্রশান্তি ও স্থিরতা বিরাজ করছে। শত্রুরাও খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালে নির্দ্বিধায় সেখানে পোঁছে যান। একদা এক ইহুদী মহিলা তাঁর খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দেয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ইলহামের মাধ্যমে তিনি বিষয়টি জানতে পেরে যান। আর এভাবে তিনি এর ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পান। তিনি এতটা আশ্বস্ত কিভাবে থাকতেন? এর একমাত্র কারণ, তিনি এমন এক সত্তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন যিনি অদৃশ্যের সংবাদ জানেন, যে সত্তার সঙ্গে কারো সম্পর্ক স্থাপিত হলে তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান থেকে বান্দাকেও প্রয়োজন মত কিছু অংশ দান করে থাকেন। কাজেই তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী আশ্বস্ত থাকে। ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতিতে অপার প্রশান্তি আর জাগতিক উন্নতিতে সীমাহীন অশান্তি ও অস্থিরতার একটি আধ্যাত্মিক কারণও আছে। কারণটি হল, মানুষ যত বেশি জাগতিক উন্নতি অর্জন করে, তার সম্পদ তত বেশি সংশয়পূর্ণ হয়ে পড়ে আর তাতে অন্যান্য ব্যক্তিদের অংশ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে না। আধ্যাত্মিক উন্নতিতে মানুষ যত উন্নতিই করুক না কেন, সে কেবল নিজের অংশটুকুই পায়, অপরের কোন অংশ আত্মসাৎ করে না। কুরআন করীমের অন্যত্র এই বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে- মোমেন জান্নাত লাভ করে যার বিবরণ- عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ (আলে ইমরান: ১৪)। অর্থাৎ- জান্নাতের সকল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রত্যেক মোমেন লাভ করবে। পার্থক্য এটুকুই যে প্রত্যেক মোমেন নিজের ক্ষমতা অনুসারে তা থেকে উপকৃত হবে। কাজেই আধ্যাত্মিক উন্নতিতে কারো অধিকার আত্মসাৎ করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। আর মোমেন কারো অধিকার হরণ আত্মসাৎ করে না, তাই সে প্রশান্ত হৃদয় থাকে, তার মনের উপর পাপ ও অধিকার হরণের বোঝা থাকে না।

(তফসীর কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১৬-৪১৭, প্রকাশনা-২০১০, কাদিয়ান)

তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দাতাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ জ্ঞাপন

যেমনটি জামাতের সদস্যগণ অবগত আছেন যে তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের ছয় মাসেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু যারা চাঁদা দেওয়ার অঙ্গীকার লিখিয়েছিলেন, ওকালত মাল-এর তথ্য অনুযায়ী তাদের অনেকের চাঁদা এখনও অনাদায়ী রয়েছে। ভারতের সমস্ত জেলা স্তরীয় আমীর, স্থানীয় আমীর, জামাতের সদর ও তাহরীকে জাদীদ সেক্রেটারীগণের কাছে আবেদন করা হচ্ছে যে, স্থানীয় মুবাল্লিগ ও মুয়াল্লিমদের সহযোগিতা নিয়ে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় উপলক্ষ্যে 'তাহরীকে জাদীদ মাল-সপ্তাহ' উদযাপন করুন, যাতে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ারের পক্ষ থেকে পাওয়া লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়, কিম্বা তা ছাপিয়ে যাওয়ার তৌফিক লাভ হয়। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-"একথা চিন্তা করো না যে তাহরীকে জাদীদ আমার পক্ষ থেকে প্রবর্তিত হয়েছে। না, আমি এর প্রতিটি শব্দ কুরআন করীম থেকে প্রমাণ করতে পারি আর প্রত্যেকটি নির্দেশ রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর নির্দেশনামা থেকে দেখাতে পারি। কিন্তু চিন্তাশীল মনন এবং ঈমান আনয়নকারী হৃদয়ের প্রয়োজন। তাই একথা চিন্তা করো না যে যা কিছু আমি বলেছি তা আমার পক্ষ থেকে, এগুলি তাঁর কথা যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। যদি আমার মৃত্যুও হয়,তবে তিনি অন্যের মুখ দিয়ে এই একই কথা উচ্চারণ করাবেন আর তার মৃত্যুর অন্য কারো মুখ দিয়ে। তিনি ক্ষান্ত হবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদেরকে এর অধীন না করেন।"

(খুতবা জুমা প্রদত্ত, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৫)

আল্লাহ্ তা'লা সকল চাঁদা দাতাদের প্রাণ ও সম্পদে অসামান্য আশিস দান করুন। আমীন।

(উকীলুল মাল, তাহরীকে জাদীদ)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir